ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা কথা সাহিত্যে যে ক'জন স্বনাম ধন্য মৌলিক প্রতিভাবান কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এক অসাধারণ লেখনীর স্পর্শে কথাশিল্পের ভুবনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত হয়ে রইলেন লেখক প্রমথনাথ। । কখনো নিছক বাংলা তথা ভারতের বিস্মৃত গৌরবময় অতীত ইতিহাস প্রীতিবশে প্রাচীন হিন্দুযুগে কখনো মোঘলযুগে কখনো আধুনিক যুগে সংঘাতমুখর যুগজীবনের কাহিনী তুলে ধরতে গিয়ে ভ্রমণরসিকের মন্ত্রে অতীত ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন। বলা বাহুল্য অতীতের প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ হল ঐতিহ্যপ্রীতি। জমিদারী ব্যবস্থাটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপ্রীতির নির্দশন। কালের গতিতে গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমময় সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে যাচ্ছে শিল্পীহৃদয়ের অন্তস্পর্শী বেদনা রোমান্টিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অথচ প্রাচীন ও নবীন কালের দ্বন্দ্বে শিল্পীমন দ্বিধান্বিত তবুও অনেক বেদনায় বরণ করে নিতে হল নতুনকে। এক বিশাল যুগের উত্থান পতনের ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তুলতে গিয়ে অভিনব বিষয়বস্তু, চরিত্র, ঘটনা, শিল্পরূপ নিপুণ তুলির স্পর্শে আজও পাঠকমনে কৌতূহলের সঞ্চার ঘটিয়ে শিল্প সিদ্ধির জগতে পৌঁছে দিলেন কল্লোল ও কল্লোলোত্তর যুগের শক্তিমান কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশী।

প্রমথনাথ যখন কথাশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তখন কথা সাহিত্যের রাজপথ বহুদূর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজা জমিদার নিয়ে ঘটনাপ্রধান উপন্যাস রচিত হয়েছে মনোবিশ্লেষণের ব্যাপকতা তখন ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নাগরিক অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত চরিত্র নিয়ে মনোবিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন, শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত চরিত্র অবলম্বনে সমাজের আচার সংস্কারমুক্ত সনাতন রীতির সঙ্গে প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন সহানুভূতির সঙ্গে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেম ও রোমান্স দৃষ্টি নিয়ে তীক্ষ্ম জীবন সমস্যা এড়িয়ে গেলেন, তারাশঙ্কর

হাজার চরিত্র নিয়ে প্রাচীন ও নবীন কালের দ্বন্দ্বের মানব চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন, মানিক আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলেন, বনফুল আঙ্গিক ও রীতিগত বৈচিত্র্য নিয়ে মানব মনের গভীর মনস্তত্ত্বের রূপ দিয়েছেন। এছাড়া কল্লোলযুগের অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব এই কল্লোল ত্রয়ী ফ্রয়েড, এলিস ও কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাবে প্রেম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের পাশাপাশি ঐতিহাসিক উপন্যাসধারা নতুন খাতে এগিয়ে চলল। আধুনিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গোপাল হালদার, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, রমাপদ চৌধুরী, মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু প্রমুখ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এছাড়াও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে এবং স্বদেশী ও বিদেশী ঘটনাপ্রবাহের সূত্র ধরে আঞ্চলিক উপন্যাসের উদ্ভব হল। আঞ্চলিক উপন্যাস শাখার উদ্ভবের পেছনে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'উত্তরা', 'প্রগতি', 'সংহতি', 'ধূপছায়া', 'আত্মশক্তি' পত্রিকার তরুণ লেখকগোষ্ঠী কথাসাহিত্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্য নীচুতলার নরনারীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মন, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, সুবোধ ঘোষ, অমরেন্দ্র ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রমুখ কথাশিল্পী আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাকে সমৃদ্ধ করে তুললেন।

সাধু ও চলিত ভাষার পাশাপাশি সংবেদনশীল কথাশিল্পীরা আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে ভাষার পরিধিকে বিস্তৃততর করলেন। তারাশঙ্কর বীরভূমের, মনোজ যশোরের, শৈলজানন্দ বর্ধমানের, বুদ্ধদেব ঢাকার, অচিন্ত্যকুমার নোয়াখালির, নারায়ণ জলপাইগুড়ির, অমরেন্দ্র বরিশালের, সুশীল জানা মেদিনীপুরের, প্রমথনাথ রাজসাহীর, পাবনা ও যশোহর, এবং সরোজ কুমার মুর্শিদাবাদের উপভাষাকে স্থানীয় জীবন বৃত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন।

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশী সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই স্বচ্ছন্দপদচারণা করলেও বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক। বিশেষত উপন্যাস শাখাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তিনি সেই ধরণের কথা সাহিত্যিক নন যে রোমান্টিক সৌন্দর্য ও ভাবের ফল্গুপ্রবাহে পাঠক মনে চমক সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি অভিজ্ঞতার শিল্পী। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে দেশ কাল সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সুন্দর ও মহৎ সৃজনশীল সাহিত্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। সত্য শিব ও সুন্দরের পূজারীরূপে নীল সরস্বতীর নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। তিনি নিছক প্রকাশের ব্যাকুলতায় তার সৃষ্টি সাজান নি, সাজিয়েছেন জ্ঞানের আলোকে, মননের তীক্ষ্মতায়, অনুভূতির প্রগাঢ়তায়, কবিত্বের ঝরণাধারায়, বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যে, মনোবিশ্লেষণের প্রজ্ঞায়, সরস প্রকাশভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শিল্পীমর্যাদার অধিকারী। মোহিতলাল মজুমদার 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থে প্রমথনাথের উপন্যাস সাহিত্যের সমালোচনার শেষে স্বীকার করছেন " বর্তমান বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন শক্তিমান লেখক।"[১] প্রখ্যাত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন - " প্রমথনাথ বিশীর রচনায় প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের অনেক উপাদান বর্তমান। প্রকৃতি বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও রহস্যবোধ, তাহার বাহিরের রূপ ও অন্তরের আবেদনে সুকুমার, কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি, ভাষার ইন্দ্রজালিক সম্পদ, অর্থগৌরবপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত রেখাবিন্যাসে বৃহৎ পটভূমিকার মর্মোদ্‌ঘাটন, স্থানে স্থানে মন্তব্যের গভীরতা ও চিত্ত বিশ্লেষণ কুশলতা - এই সমস্তগুণই উচ্চাঙ্গের ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি।"[২]

কথাশিল্পী হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিন্যাস করে নেয়া যাক। সমালোচিত দশটি উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

এক।। প্রবন্ধোপন্যাস — 'দেশের শত্রু'

দুই।। মহাকাব্যিক উপন্যাস — 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলনবিল', 'অশ্বত্থের অভিশাপ'(এই ত্রয়ী উপন্যাসে সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ)

তিন।। সামাজিক উপন্যাস — 'পদ্মা', 'কোপবতী'।

চার।। ঐতিহাসিক উপন্যাস — 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'বঙ্গভঙ্গ','পনেরোই আগষ্ট'।

প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাস — 'দেশের শত্রু', 'পদ্মা', 'কোপবতী', 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' ('জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলনবিল', 'অশ্বত্থের অভিশাপ')।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বের উপন্যাসঃ 'কেরীসাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'বঙ্গভঙ্গ', 'পনেরোইআগষ্ট'।

প্রস্তুতি পর্ব থেকে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলিতে পরিবর্তনশীল শিল্পীপ্রাণের বিভিন্ন স্তরের ক্রমবিকাশ আলোচনা করা যেতে পারে।

এক।। প্রস্তুতি পর্বের উপন্যাস 'দেশের শত্রু'তে স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস, কবি ও স্বদেশ প্রেমিকের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত।

দুই।। রোমান্টিক অনুভূতির অনুষঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতির আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলাভূমি প্রমথনাথের কলমে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

তিন।। উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক সমাজের চিত্র ধরা পড়েছে।

চার।। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বিশিষ্ট জীবনদর্শন উচ্চারিত।

পাঁচ।। রোমান্টিক আকুতি ও জীবনযন্ত্রণা প্রকাশিত।

ছয়।। জমিদারীর শৌর্য, বীরত্ব, সাংগঠনিক প্রতিভার সঙ্গে কালের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।

সাত।। কৃষিভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রয়াস।

আট।। আধুনিক যুগজীবনের ইঙ্গিত।

নয়।। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

দশ।। গঠনরীতি সরল ও বৃত্তাকার। বর্ণনায় সাধুরীতি ও সংলাপে কথ্যরীতির প্রয়োগ।

এগার।। বঙ্কিমী রীতির অনুসরণ।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বের উপন্যাসগুলিতে পূর্ববর্তী ধারার পরিবর্তন করে নতুন বিষয় ও

আঙ্গিকের চেতনা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে, লেখকের সুর স্বতন্ত্রধারার। তাঁর সৃষ্টিকৌশল এখানে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রেখেছে। লেখকের মানসপ্রবণতা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

এক।। অনাবিষ্কৃত জগৎ আবিষ্কারের প্রবণতা।

দুই।। নাগরিক সভ্যতার চিত্র অঙ্কন।

তিন।। ইতিহাস সত্যের সঙ্গে সাহিত্য সত্যের মেলবন্ধন।

চার।। রোমান্টিক কল্পনা বিলাসিতা।

পাঁচ।। যুগযন্ত্রণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

ছয়।। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি।

সাত।। রাজনৈতিক আদর্শবাদ।

আট।। দেশ কালের ব্যাপকতা।

নয়।। ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুরতা।

দশ।। আঙ্গিক সচেতনতা।

এগার।। ভাষার সাবলীলতা কথ্য ভাষার সুষম ব্যবহার।

বারো।। জটিল কাহিনীবৃত্তের উপস্থাপন।

তেরো।। প্রেমমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ।

চৌদ্দ।। মননশীল অনুভূতি।

শ্রেণীবিন্যাসের ও উপন্যাস সৃষ্টির ক্রমবিকাশের পর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হয় সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

এক।। একনজরে উপন্যাসের স্থান, সমস্যা, কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রধান অভিঘাত।

দুই।। উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য।

তিন।। কালচেতনা।

চার।। সংলাপরীতি।

পাঁচ।। রূপ বর্ণনা।

ছয়।। প্রেম বোধ।

সাত।। মনস্তত্ত্বমুখিতা।

আট।। মৃত্যুচেতনা।

নয়।। চরিত্রসৃষ্টি।

দশ।। নিসর্গ চেতনা।

এগার।। ঘটনার ঐক্য এবং সামগ্রিক উপস্থাপনায় একটি পরিপূর্ণ প্রতিমা অঙ্কন।

বার ।। ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাণ চেতনা ।

তের।। ভাষা শৈলী।

চৌদ্দ।। লৌকিক উপাদান।

পনেরো।। লেখকের জীবনদর্শন।

সারণীঃ উপন্যাসের স্থান, সমস্যা, কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রধান অভিঘাত

উপন্যাস	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব	প্রধান
'দেশের শত্রু'	কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল	রাজনৈতিক	সুরদাসবাবু	অভিঘাত রাজনৈতিক মতানৈক্য
'পদ্মা'	রাজসাহী জেলার চরচিলমারী গ্রাম	প্রাক্‌বিবাহিত প্রেমের যন্ত্রণা	বিনয়	প্রেমমনস্তত্ত্ব
'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'	উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার জোড়াদীঘি ও রক্তদহ গ্রাম	জমিদারী লড়াই ও কালের দ্বন্দ্ব	উদয়নারায়ণ	সামন্ততান্ত্রিক ও আর্থ সামাজিক
'চলনবিল'	ধুলোউড়ি গ্রাম	(ক) অরাজকতা (খ) প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রমের চেষ্টা	দর্পনারায়ণ	কৃষিভিত্তিক সমাজ ও প্রকৃতির রুদ্ররূপ।

উপন্যাস	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব	প্রধান অভিঘাত
‘ অশ্বত্থের অভিশাপ ’	জোড়াদীঘি গ্রাম	শরিকি দ্বন্দ্ব ও ভূমিকম্পের প্রলয়ঙ্করী রূপ	নবীননারায়ণ	আর্থ সামাজিক
‘ কোপবতী ’	বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের পাশে তালবনী গ্রাম	প্রকৃতির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে ব্যাহত দাম্পত্য জীবন	বিমল	অন্তর্দ্বন্দ্ব
‘ কেরী সাহেবের মুন্সী ’	জোড়ামউ গ্রাম কলকাতা, কাশীপুর, শ্রীরাম পুর ও মদনাবাটি	সহমরণের নারকীয় বীভৎসতা	রামরাম বসু	রক্ষণশীল প্রগতিশীলের দ্বন্দ্ব
‘ লালকেল্লা ’	শাহজাহানাবাদ ও লক্ষ্ণৌ	সিপাহী বিদ্রোহোত্তর মোঘল বাদশার বিপর্যয়	জীবনলাল	ব্রিটিশ কোম্পানী বনাম শাহজাহানাবাদের বাদশা
‘বঙ্গভঙ্গ ’	দিনাজপুর ও রাজসাহী	পরাধীনতা	যজ্ঞেশ রায়	স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে ইংরেজ শক্তির বিরোধ
‘পনেরোই আগষ্ট ’	দিনাজশাহী ও কলকাতা	স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা	শচীন	ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর দ্বন্দ্ব

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য

গবেষণা প্রকল্পের একটি অধ্যায় পুরোপুরি বিষয়বস্তু এজন্য শ্রেণী নির্ণয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন নিম্নে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হল।

(ক) সামাজিক উপন্যাস ঃ

প্রমথনাথ বিশীর সামাজিক উপন্যাস গুলির বিষয়ভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যতার দাবী রাখে । 'পদ্মা', 'কোপবতী', 'জোড়দীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের বিষয়বস্তু অভিনব।

প্রমথনাথের 'পদ্মা', ও 'কোপবতী' নদী কেন্দ্রিক সামাজিক উপন্যাস। বঙ্গ সাহিত্যে নদীনির্ভর উপন্যাসের অভাব নেই। নদী ও নদীতীরবর্তী মানুষদের নিয়ে মানিক বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন 'পদ্মানদীর মাঝি', সমরেশ বসু লিখেছেন 'গঙ্গা', অদ্বৈত মল্লবর্মন লিখেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম', দেবেশ রায় লিখেছেন 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় বিজয় নগরের ইতিহাস অবলম্বনে 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' লিখলেন। উপন্যাসগুলিতে নদী নেপথ্যে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে নদী হয়ে উঠেছে উপন্যাসের নায়ক কিংবা নায়িকা। প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসে যেমন পদ্মার ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠেছে তেমনি 'কোপবতী' উপন্যাসে কোপাই নদী নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারাশঙ্কর অজয়, ময়ুরাক্ষী ভাগীরথী ও কোপাই নদীকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। 'হাঁসুলী বাকের উপকথা'য় , কোপাই নদী, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে ভাগীরথী নদী পটভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এনেছেন। সরোজ কুমার রায় চৌধুরী ' ময়ুরাক্ষী' উপন্যাসে ময়ুরাক্ষী তীরবর্তী গ্রামের ভৌগোলিক পটভূমি ও স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে বিভিন্ন ঋতুতে ময়ুরাক্ষীর বর্ণনা অনবদ্য ভাবে দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ যশোহর জেলার বুক চিরে প্রবাহিত ইছামতী নদীর বর্ণনা দিয়েই 'ইছামতী' উপন্যাসের শুরু করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'মহানন্দা' উপন্যাসের মহানন্দা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন । অমরেন্দ্র ঘোষ 'চরকাশেম' উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী ও পদ্মার চরের হিন্দু মুসলমান চাষীদের জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। প্রমথনাথ শুধু নদীই নয় পাবনা জেলার উপকণ্ঠে একটি বিল যার নাম 'চলনবিল'— এই বিল ও তার তীরবর্তী ধুলোউড়ি গ্রামকে নিয়ে লিখেছেন 'চলনবিল' উপন্যাস ।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রমথনাথ বিশীর সময়কাল পর্যন্ত বাংলা সামাজিক উপন্যাস ছিল বিচিত্র মুখী। বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে সামাজিক উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হলেও তা ছিল

রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী' উপন্যাসে অভিজাত শ্রেণীর নায়করা কামনা ও প্রেমে মত্ত হয়ে স্ত্রীর প্রতি অনাসক্তি দেখিয়ে সুন্দরী, রূপসী বালবিধবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে জীবনযন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হতে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালিতে' মহেন্দ্র আশা বিহারী বিনোদিনীর মনস্তাত্ত্বিক দিক আলোকপাত করেছেন রোমান্স রাজ্য থেকে মুক্ত করে। 'গোরা', 'চতুরঙ্গে' জাতপাতের ঊর্ধ্বে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', উপন্যাসে তৎকালীন ঘুণধরা সমাজকে দায়ী করে নারীর মূল্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', এ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতি সমান্তরাল ভাবে থেকে বাংলা সামাজিক উপন্যাসে নূতন অধ্যায় সূচনা করলেন। তারাশঙ্কর অভিজাত শ্রেণীর পাশাপাশি ডোম, কাহার, কামার প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীকে নায়ক করে কালের দ্বন্দ্ব দেখালেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে চেতন মনের সঙ্গে অচেতন মনের দ্বান্দ্বিক রূপ দেখালেন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আলোকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র শহর ও শহরতলির নগ্ন বাস্তবচিত্র সামাজিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করলেন। জগদীশ গুপ্ত রূঢ় বাস্তব দিক তুলে ধরলেন। অচিন্ত্যকুমারের কলমে নগর জীবনের কুৎসিত দিকের সঙ্গে প্রেম মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরলেন, বুদ্ধদেব বসু দেহকে ঘিরেই প্রেম ভাবনা উপস্থাপন করতে গিয়ে দেহ ও দেহাতীতের কথা বর্ণনা করলেন। সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রমজীবি মানুষদের নিয়ে, অদ্বৈত্ব মল্লবর্মন তিতাস পারের মালোপাড়ার জীবন, মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী, সাওঁতাল, মুন্ডা, হেমব্রমদের নিয়ে লিখলেন, 'হাজার চুরাশির মা', 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের এই ধারার

পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর সামাজিক উপন্যাসের বিষয় এক স্বতন্ত্রধারা নিয়ে এল।

প্রমথনাথের 'কোপবতী' উপন্যাসে সমাজজীবনের চেয়ে ব্যক্তিজীবনের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। বীরভূমের কোপাই নদীকে কেন্দ্র করে লেখা এই উপন্যাসটিতে প্রকৃতির বহিরঙ্গে মানবজীবনের কাহিনী মূল বিষয়। বিমল ও ফুল্লরা এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। বাঘ শিকার করতে গিয়ে বাঘের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে পতিতপাবন বাবুর সঙ্গে প্রতিবেশীর পরিচয় সূত্রে বিমল ও ফুল্লরার প্রথম দর্শনে প্রেমানুরাগ জাগ্রত হয়। বিমলের স্বপ্নদর্শন ও ফুল্লরার আগমনে বঙ্কিম রোমান্সের লক্ষণ প্রভাবিত। কোপাই এর তীরে কখনো বনলক্ষ্মীর আগমনে এক রোমান্টিক প্রেমমধুর চিত্রাঙ্কনে লেখকের প্রকৃতি চেতনা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এখানে ফুল্লরা যেন বনলক্ষ্মীর প্রতীক। বনলক্ষ্মীর পুষ্পাভরণে সজ্জিতা ফুল্লরা ও বিমল যেন এক রোমান্টিক জগতের বাসিন্দা। বিমল এখানে প্রকৃতি প্রেমিক উদাসী চরিত্র। তবে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দার্শনিক সুলভ হয়ে ওঠে নি। প্রাক্‌বিবাহিত প্রেমে ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্ব উচ্চারিত হয়েছে। প্রাক্‌বিবাহিত জীবনের প্রণয় রোমান্স দাম্পত্য জীবনে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। শুরু হয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মান অভিমানের পালা। প্রমথনাথ বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গিতে দাম্পত্য জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবাহোত্তর জীবনে কোপাই হয়ে উঠেছে ফুল্লরার প্রতিদ্বন্দ্বী। কোপাই এর উৎস সন্ধানে বিমলের যাত্রা কবিসুলভ কল্পনার নামান্তর। মিশকির কালো পাথর ফুল্লরার কেনা এবং তা হারিয়ে ফেলে পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়টি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিবাহোত্তর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক প্রশান্তির প্রত্যাশায় বিমলের কোপাই এর উৎস সন্ধানে যাত্রার অভিজ্ঞতা অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও প্রকৃতি প্রেমের পরিচয়বহ। কোপাই এর সঙ্গে তার সহজাত আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল পূর্ব থেকেই। বিমল বহুবার ফুল্লরাকে শুনিয়েছে কোপাই হল ফুল্লরার সতীন। একদিকে প্রকৃতি প্রেম অপর দিকে ফুল্লরার রূপজ

মোহ এই দ্বৈত টানা-পোড়েনে প্রকৃতির জয় ঘোষিত হল। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে কোপাই নদীর প্রবল গর্জনে সে খুঁজে পেল শান্তির পথ। কোপাই বক্ষে ঘটল তার সলিল সমাধি। কোপবতীর মায়াবী আকর্ষণে তার জীবনে ঘটেছিল এই অন্তিম পরিণতি। কোপাই এর অনুধ্যান বিমলকে শান্তি দিতে পারেনি — " সে প্রকৃতিকেও পাইল না মানুষকেও হারাইল।" নিঃস্ব রিক্ত ফুল্লরার বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার সময় উদাসী কোপাই স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলেছে। বিমলের বিশ্বাসী ভৃত্য মিতন দাদাবাবুর প্রত্যাশায় অপেক্ষমান। প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনের নৈসর্গিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও গভীর মন্তব্য করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। উপন্যাসটিতে লেখক মৃত্যু চেতনা উপস্থাপিত করেছেন চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণামরূপে। চেতনাপ্রবাহ রীতির মানসিক বিকার বিমল চরিত্রে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। প্রমথনাথ এখানে নিয়তিবাদকেই মেনে নিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে যুগযন্ত্রণার ছাপ নেই, নেই সামাজিক কোন অভিঘাত, মনস্তত্ত্বমুখিতা মূল বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। গতানুগতিক উপন্যাস ধারা থেকেই আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠক মনে স্বতন্ত্র স্বাদ এনে দিয়েছে এখানেই প্রমথনাথ বিশীর অভিনবত্ব।

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা' উপন্যাসটি অভিনবত্ব বহন করে। নদীকেন্দ্রিক গতানুগতিক উপন্যাস থেকে 'পদ্মা' উপন্যাসটি স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হতে পেরেছে। প্রমথনাথ এই উপন্যাসে হয়ে উঠেছেন সমাজসচেতক শিল্পী। ভৌগোলিক পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছে উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম চরচিলমারী যা পদ্মার উপকণ্ঠে জেগে ওঠা একটি চরমাত্র। অমরেন্দ্র ঘোষের 'চর কাশেম পুর' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস থেকে আলোচ্য উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্যতার দাবী রাখে। হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে নায়িকা নির্বাচন করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি

বিনয় উপন্যাসের নায়ক যার সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটেছে বহুবার। তবুও এই উপন্যাসে পদ্মা নদী নেপথ্যে নায়কের ভূমিকা পালন করেছে। পদ্মার করাল গ্রাসে বহু চর জেগে ওঠে আবার পদ্মার ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পদ্মার চরের অস্তিত্ব। চরচিলমারী গ্রামের এক অসচ্ছল পরিবারের কন্যা কঙ্কণের সঙ্গে কলকাতায় কলেজে পড়া এক ছাত্র ছুটিতে নৌকাভ্রমণ ও বনভোজনের সূত্র ধরে রাজসাহীর এক যুবক বিনয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একটি হাঁস ফেরত দিতে এসে বিনয় ও কঙ্কণের প্রথম প্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল এর পেছনে চেতনাপ্রবাহরীতির লিবিডোর প্রভাব আছে পাঠক মাত্রই তা উপলব্ধি করতে পারে। আসা যাওয়া সূত্রে খাবার আমন্ত্রণ রক্ষার্থে কঙ্কণের রন্ধন শিল্পের নিপুণতা ও সোলার টোপর বানাবার বিশেষ গুণ বিনয়কে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। পদ্মার তীরে একটি জলাশয়ে বিনয়ের মাছ ধরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর বারুণীচিত্র ও 'বিষবৃক্ষ' এর বাপীতট আমাদের স্মরণ করায়। এই জলাশয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে উঠেছে কিশোরী কঙ্কণের মুখচ্ছবি। পদ্মার তীরে কখনও জলাশয়ের ধারে রোমান্টিক প্রণয় প্রণয়ীর প্রেমানুরাগ কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ফ্রয়েডীয় যৌনমনস্তত্ত্বের সঙ্গে ঘটেছে বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষা সূত্রে বিনয়কে চলে যেতে হয় কলকাতায়। ধীরে ধীরে নাগরিক সভ্যতার রূপজ মোহে আকৃষ্ট হয়ে কঙ্কণের ভালোবাসার মূল্য না দিয়ে অধ্যাপক কন্যা পারুলের সঙ্গে গড়ে ওঠে সম্পর্ক। লেখক ভিন্নধর্মী এই দুই নারী চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন সুনিপুণভাবে। পারুলকে বিয়ে করার প্রস্তাব উত্থাপন করার প্রসঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে পারুলের সংঘাত জটিলতর হয়ে ওঠে। বিনয় পারুলের প্রেম প্রত্যাখানের পর মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার জন্য কলকাতা থেকে ফিরে আসে রাজসাহীতে। উপেক্ষিত কঙ্কণের মধ্যেই খুঁজে পেতে চেয়েছিল জীবনের পরম সান্ত্বনা। এদিকে কঙ্কণের অসামাজিক মাতৃত্বের সূচনায় আত্মঘাতী হয়ে মারা যায় পিতা তারণদাস।

বনোয়ারীলালের মতো কুৎসিত সুদখোর মহাজনের প্রলুব্ধ দৃষ্টি ও তার ষড়যন্ত্রের ফলে বিষময় হয়ে ওঠে কঙ্কণের জীবন। বিনয়ের অনন্ত প্রতীক্ষায় যন্ত্রণাকাতর অনুভূতি ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দেয় বসন্তরোগ শয্যায়। হারিয়ে যায় তার রূপ ও সৌন্দর্য। বসন্তের দাগে তার মুখ মন্ডল হয় বিবর্ণ। অপ্রত্যাশিতভাবে বিনয়ের আগমন ঘটে কঙ্কণের আঙিনায়। লুপ্তশ্রী কঙ্কণ প্রতিজ্ঞা করে বসে এই বিবর্ণ চেহারা দেখাবে না বিনয়কে । বিনয় ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গিয়ে আশ্রয় নেয় হিমালয়ের কোলে। ঘটনাচক্রে দার্জিলিংএ পারুলের সঙ্গে ঘটে পরিচয়। পারুলের পিতা মাতার উদ্যোগে স্থির হয় পারুলের সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ। এদিকেএকটা ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে কঙ্কণ বিয়ের টোপর পৌঁছে দেয় বিনয় ও পারুলের বিয়ের দিনে। সেখানে নবজাতশিশু কোলে কঙ্কণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিনয়ের। কঙ্কণ দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে পদ্মার তীরে উপস্থিত হয় নৌকাযোগ চরচিলমারীতে পৌঁছুবার জন্য। বিনয় ভুলে যেতে পারেনি কঙ্কণকে। অতীত স্মৃতির পথ বেয়ে পারুলের সঙ্গে বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করে অনুসরণ করে কঙ্কণের পথ। ক্ষণিক পরিচয় মুহূর্তে বর্ষার পদ্মার প্রলয়ঙ্করীরূপ ধারণ করে, পার ভাঙ্গা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায় কঙ্কণ পদ্মাগর্ভে। বিনয়কে শিশুপুত্র কোলে দিয়ে কঙ্কণের অন্তিম পরিণতি ও বিনয়কে এক ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে। উপন্যাসে পদ্মাবক্ষে বিনয়ের নৈশ নৌকা অভিযান নক্ষত্র খচিত রাত, জলতরঙ্গ নির্জনতা রহস্যময় হয়ে উঠেছে যা রোমান্টিক চেতনার পরিচয় বহ। এছাড়াও কঙ্কণের নিশীথে পাওয়ার ঘটনার বর্ণনায় বিভূতিভূষণের 'দেবযান' উপন্যাসের নিখিল বিশ্বের রহস্যময়তার সঙ্গে তুলনীয়। প্রমথনাথ 'পদ্মা'র কাহিনীর সঙ্গে অবিনাশ বাবু ও সর্বেশ্বরীর কলহ তাদের সন্তানবাৎসল্য, আড্ডার বর্ণনা, গ্রামীণ কুৎসা, ভাগচাষীর মনোভাব, পোষ্টমাস্টারের সরলতা, গ্রামীণ বিচার প্রভৃতি। পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের চিত্র বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলছেন। তবে প্রকৃতিচিত্রণে ও

জীবনরস আস্বাদনে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় ঘটেছে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথের 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' 'চলনবিল' ও 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাস ত্রয়ীর একত্রে নামকরণ করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত'। উত্তরবঙ্গে র রাজসাহী জেলার জমিদার শ্রেণীভূক্ত চৌধুরী পরিবারের উদ্ভবের ইতিহাস থেকে প্রায় দেড়শত বছরের জীবনকাহিনী যুক্ত হয়েছে এই ট্রিলজিতে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী উপন্যাসকে মহাকাব্যিক, তরুণ ঘোষ 'প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে ইতিহাসের অন্তর্লীন অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। ডঃ অশোক কুন্ডু - সামাজিক উপন্যাস শ্রেণীভূক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে জমিদার শ্রেণীদের কেন্দ্র করে অসংখ্য উপন্যাস রচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র দত্ত, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর গোবিন্দলাল, 'রজনী'র শচীন্দ্রনাথ, 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বর রায়, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ, 'আনন্দমঠে'র মহেন্দ্র সিংহ প্রত্যেকেই জমিদার শ্রেণীভূক্ত নায়ক চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র ও বিহারী, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মুকুন্দলাল ও বিপ্রদাস, 'দুই বোনে'র রাজারাম প্রত্যেকেই জমিদার। শরৎসাহিত্যে 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ চৌধুরী, 'বামুনের মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে, 'চন্দ্রনাথে'র চন্দ্রনাথ, 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ, 'পল্লীসমাজে'র বেণী ঘোষাল, রমেশ প্রত্যেকেই জমিদার চরিত্র। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ, 'চৈতালী ঘূর্ণি'র নায়ক গোষ্ঠ জমিদার, 'কালিন্দী'র জমিদার ইন্দ্ররায়, 'গণদেবতা'র দ্বারিক চৌধুরী, 'জবানবন্দী' উপন্যাসে ছয়পুরুষের জমিদার শ্রেণীভূক্ত। মনোজ বসুর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে'র নরহরি চৌধুরী ও শিবনারায়ণ ঘোষ, 'স্বর্ণসজ্জায়' রায়বাড়ির জমিদার চন্দ্রভানু প্রত্যেকেই জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। প্রমথনাথ বিশীর ত্রয়ী উপন্যাসে জমিদার উদয়নারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও নবীননারায়ণ, পরন্তপ পলাশী গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, ইন্দ্রাণী

রক্তদহের কর্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে রক্তদহের জমিদার। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জমিদার থেকে প্রমথনাথের জমিদার শ্রেণী স্বাতন্ত্র্যতার দাবি রাখে। তবে তারাশঙ্কর ও মনোজ বসুর জমিদার চরিত্র কেন্দ্রিক উপন্যাসের সঙ্গে প্রমথনাথের উপন্যাসের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা এই সময় থেকেই সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় শুরু হয়। প্রমথনাথ, তারাশঙ্কর ও মনোজ বসুর উপন্যাসে কালের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। প্রত্যেকেই জমিদারী পৌরুষ, বীরত্ব, ঐশ্বর্য আভিজাত্যের প্রতি মুগ্ধ তবুও গভীর বেদনায় অতীত গৌরবকে বাধ্য হয়েই বিদায় দিতে হয়েছে।

প্রমথনাথের সঙ্গে অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের পার্থক্য এখানেই প্রমথনাথ ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সনাতনপন্থী, অত্যাধুনিক চিন্তা চেতনার ঘোর বিরোধী। নায়িকা চরিত্র নির্মাণে ও কাহিনী গ্রন্থনে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডটি মধ্যযুগীয় প্রভাব মুক্ত হয়ে ওঠে নি, তবে তৃতীয় খন্ডে আধুনিক যুগজীবনের ছবি ফুটিয়ে তুললেও ঘটনাধারায় অতীত ঐতিহ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রথম খন্ডের পল্লীর সনাতন ভাবধারাপুষ্ট উদয়নারায়ণ ও দর্পনারায়ণ, দ্বিতীয় খন্ডে হতশ্রী জমিদার গঠনমূলক কাজে অংশ নিয়েছে। তৃতীয় খন্ডের নায়ক সুদূর কলকাতা থেকে জোড়াদীঘির সম্পর্ক রাখলেও স্থানীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়েছে। ইন্দ্রাণী ও বনমালা চরিত্রের সৌন্দর্য ও সক্রিয়তায় বঙ্কিমী প্রভাবে প্রভাবিত হলেও পৌরাণিক নায়িকার সঙ্গে তুলনীয়। প্রথমখন্ডে জমিদারী দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠলেও দ্বিতীয় খন্ডে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারকে আমরা ভিন্নরূপে পাই। বন্যা ও ভূমিকম্পে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের কাহিনীর পরিণতি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। প্রমথনাথ উপন্যাসত্রয়ে প্রকৃতিবর্ণনায় স্থানীয় জনজীবনের বিশ্বাস, সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতির যে অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা ধারায় রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করেছে তবে নাটকীয়তা, অনুভূতি, মননশীলতা ও কাব্যগুণে উপন্যাসত্রয় স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

যে কোন উপন্যাস শিল্পের প্রাথমিক উপকরণ হল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনীবৃত্ত, পরিবেশ ও পটভূমি, চরিত্র, সংলাপ, রচনা শৈলী ও ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন। সামাজিক উপন্যাসের এই শর্তগুলির সঙ্গে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখে ইতিহাস সত্যে পৌছাতে হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে চিরন্তন মানব হৃদয়ের সুষম সমন্বয়ে ইতিহাস হয়ে ওঠে জীবন্ত। তখন ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক হয়ে ওঠে অতীত যুগের ইতিহাস। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'দেবীচৌধুরাণী', 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য ও সাহিত্য তথ্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', সার্থক উপন্যাস শিল্পের স্তরে পৌঁছাতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে নি। তারাশঙ্করের 'রাধা', 'গন্নাবেগম' উপন্যাসে ইতিহাস রস সৃষ্টি হলেও বঙ্কিমের মতো গভীরতা লাভ করে নি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা', 'লালমাটি', 'পদসঞ্চার' উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'গৌড়মল্লার' ঐতিহাসিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এছাড়া আধুনিক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গোপালক মজুমদারের 'রাওয়ালা', গোপাল হালদারের 'একদা', গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা', মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের - 'নটী', রমাপদ চৌধুরীর - 'লালবাঈ', শক্তিপদ রাজগুরুর -'মণিবেগম', দেবেশ রায়ের 'রক্তরাগ', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখন্ড' স্বাধীনতার অব্যবহিতআগের 'দাঙ্গাহাঙ্গামা', 'মন্বন্তর, ও দেশবিভাগের

বিষয় নিয়ে লেখা উপন্যাসটিতে ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশী ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে প্রমথনাথ বিশীর সফল সৃষ্টি 'সিন্ধু নদের প্রহরী' ,'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাস । প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভের সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন প্রমথনাথ।

প্রমথনাথের 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন জীবনধারাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচন করেছেন। রামরাম বসুর জীবন অবলম্বনে কথা সাহিত্যে লিখতে গিয়ে নবাগত ইংরেজ প্রভাবিত বাঙালি জীবনচিত্র, ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরীর বঙ্গদেশে আগমন ও তাঁর সক্রিয়তা ইংরেজদের আচার, ব্যবহার, বিলাসিতা, ইংরেজদের প্রেমভাবনা বাংলার দলাদলির চিত্র, সহমরণের বীভৎসতা, বাবু সমাজের চিত্র, কলকাতার পথঘাট, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন, চিতা পালিয়ে আসা রেশমীর জীবন সঙ্কট পরিশেষে মর্মান্তিক আত্মাহুতি ট্র্যাজিক বেদনা সৃষ্টি করেছে ।ইতিহাস ও ইতিহাস সম্ভাবনা সঞ্জাত বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনায় কলকাতা জীবনের সুদীর্ঘ ২০ বছরের অখন্ড জীবন প্রবাহ ইতিপূর্বে কোন কথাসাহিত্যিক তুলে ধরতে পারে নি । যদিও সুশীল রায়ের 'অনল আহুতি' উপন্যাসের ও শ্রী কুমারেশ ঘোষের 'এক বর অনেক কনে ' উপন্যাসের বিষয় বস্তু সতীদাহ ও বহু বিবাহ বিষয় অবলম্বনে রচিত হলেও তাতে মূলত বঙ্গদেশের পচনশীল সমাজের বাস্তবচিত্র প্রস্ফুটিত । কিন্তু প্রমথনাথের ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' উপন্যাসের মতো কলকাতা কেন্দ্রিক অখন্ড জীবন প্রবাহের দ্যোতানা অনুরণিত হয়ে ওঠে নি। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্য এখানেই।

মোঘল যুগের ইতিহাস অবলম্বনে প্রমথনাথের 'লালকেল্লা' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের

উল্লেখযোগ্য সংযোজন যদিও বঙ্গ সাহিত্যে মোঘল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে একাধিক উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সফল স্বপ্ন' উপন্যাসের বিষয় ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মারাঠা বীর শিবাজীর দ্বন্দ্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঘটনা উদয়পুরের রানা ভীমসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধের কাহিনী, রমেশ চন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ', 'বঙ্গ বিজেতা', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাস, চন্ডীচরণ সেনের 'ঝান্সির রাণী', 'অযোধ্যার বেগম', হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গমহল', 'শীশ্মহল' ও 'নূরমহল', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লুৎফ উল্লা', তারাশঙ্করের 'গন্না বেগম', গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা' সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। পাশাপাশি প্রমথনাথ সিপাহী বিদ্রোহোত্তর মোঘল বাদশা বাহাদুর শাহের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন ভারতের আচার ব্যবহার, প্রথা সংস্কার, অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্থান কালকে অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের নায়ক কোম্পানীর রেসেলাদার জীবনলালের দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহোত্তর শাহজাহানাবাদের বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করেছেন। লেখক তৎকালীন যুগজীবনের বিভিন্ন দিক সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। ষড়যন্ত্র, হত্যা, ক্ষমতার দম্ভ, অবৈধ কামনা বাসনা, বিশ্বাসঘাতকতা সামাজিক অব্যবস্থা ও অনাচার ইতিহাস সচেতন শিল্পী প্রমথনাথ 'লালকেল্লা' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। বাদশা বাহাদুর শাহ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে নি। তৎকালীন নৃত্যগীত, উর্দু গজল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে সন্দেহ নেই। লেখক প্রণয় কাহিনী অনবদ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। বাদশা বাহাদুর শাহের বন্দীত্ব ও তার হাহাকার মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। প্রমথনাথ সুকৌশলে শাহজাহানাবাদের ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন। অপরদিকে ভারতীয় সিপাহীদের তুলনায় ইংরেজ সিপাহীদের তৎপরতাও রণকৌশল দিল্লির সর্বশেষ বাদশা বাহাদুর শাহের অনিবার্য পরাজয়ের ফলশ্রুতি। মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের একমাত্র সাক্ষী হয়ে অবস্থান

করছে লালকেল্লা। তার অন্দরমহলে আলোড়িত হচ্ছে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ। গঠন নৈপুণ্যে প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ স্বীকার করে নিলেও 'লালকেল্লা' উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্যতার দাবি রাখে।

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দী থেকে বহু আকাঙ্ক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত যে সব উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদী, আইন অমান্য, আগষ্ট আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত বিভাজন ইত্যাদি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঔপন্যাসিকগণ বিভিন্ন মত ও পথের উল্লেখ করেছেন সেই ইতিহাস ধারার মধ্যে কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসদ্বয় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দুটি উপন্যাসের রচনাকাল ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে এজন্য লেখক উপন্যাসদ্বয়কে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তবে উপন্যাসদ্বয়ের ঘটনাপ্রবাহ অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত একশ দেড়শ বছরের দূর অতীতের ঘটনা নয় কালচেতনার দিক থেকে নিকট অতীত বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রধান নায়ক সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা। লেখক ঐতিহাসিক চরিত্র উপস্থাপিত করলেও দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলার কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে কাল্পনিক চরিত্র উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। তবে রাজনৈতিক উপন্যাসের কোন মতাদর্শকে লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেন নি। সে দিক থেকে উপন্যাস নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। তবুও স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উপন্যাসের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' 'মন্বন্তর', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা', 'পাশাপাশি' 'জীয়ন্ত', ' স্বাধীনতার স্বাদ' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' 'ঢেড়াই চরিত মানস','চিত্রগুপ্তের ফাইল' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

'শিলালিপি','লালমাটি', 'মন্দ্রমুখর', 'আলোপর্না', 'স্রোতের সঙ্গে', মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', বনফুলের 'অগ্নি' উপন্যাসে দলীয় মতাদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু প্রমথনাথের 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাস নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। কাজেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কেন্দ্রিক পূর্বোক্ত উপন্যাস থেকে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসদ্বয় বিশিষ্টতা লাভ করতে পেরেছে সন্দেহ নেই।

বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ঘটনা দিয়ে। ইংরেজ তোষণকারী রায়বাহাদুর উপাধিধারী যজ্ঞেশ রায় নামক কাল্পনিক চরিত্র এই উপন্যাসের নায়ক। তার দুই পুত্র শচীন ও সুশীল স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ তোষণের ঘোর বিরোধী। দুজনের মধ্যে শচীন সুরেন্দ্রনাথের দলভূক্ত রিপন কলেজের অধ্যাপক , সুশীল সন্ত্রাসবাদী। অবিনাশবাবু জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শচীন ও সুশীলের রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা রূপে অবিনাশবাবুর বিশেষ ভূমিকা আছে। অবিনাশবাবুকে একাধিকবার স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবর ণ করতে হয়েছে। তার কন্যা রুক্মিণীর সঙ্গে শচীনের বিয়ে হয়। মলিনা সুশীলকে ভালবাসে কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হয় এবং জেলখানায় মারা যায়। যজ্ঞেশবাবু পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। প্রমথনাথ ফুলার সাহেব বিভিন্ন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিনিধি, নীলকর সাহেব, জেনারেল ডায়ার, পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, দারোগাদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে লেখক নরমপন্থী কিংবা সন্ত্রাসবাদী চরিত্রকে যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। কাহিনী, চরিত্র, চলিত ভাষা ইংরেজদের মুখের ভাষা এবং রঙ্গরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। গতানুগতিক রাজনৈতিক উপন্যাস কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে 'বঙ্গভঙ্গ'

অভিনবত্বের দাবী রাখে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রমথনাথের এই উপন্যাসটি একটি উল্লেখযোগ সৃষ্টি। লেখক ব্যাখ্যা অংশে জানিয়েছেন 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসকে রুচিভেদে রাজনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।" [৩]

বাংলা সাহিত্যে ভারতের রক্তাক্ত স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ নিয়ে স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ণাঙ্গ কোন উপন্যাস রচিত হয় নি। খন্ডিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল প্রমুখ কথাসাহিত্যিক উপন্যাস লিখলেও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সামগ্রিক ইতিহাস ছিল উপেক্ষিত। অথচ ১৯০ বছর ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কত নাম জানা অজানা বীর শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাধারাকে কেন্দ্র করে কোন কথাশিল্পী কলম ধরে নি। একমাত্র " ভারতের স্বাধীনতা ও শাসন শক্তির হস্তান্তর নিয়ে ইংরেজিতে লেখা গুরুত্বপূর্ণ বইটির লেখক কোন ভারতীয় নন, দুজন বিদেশী, কলিনস ও লাপিয়ের। বই এর নাম "ফ্রিডম অ্যাট নাইট" (১৯৭৫)। তাও উপন্যাস নয়। স্বীকার্য, ভীষ্ম সাহানী রচিত 'তমস' নামক হিন্দী উপন্যাসের কাছাকাছি যেতে পারে এমন উপন্যাস বাংলায় আজো লিখিত হয় নি। [৪]

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্রিশ বছরের ইতিহাস এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। 'বঙ্গভঙ্গে'র সঙ্গে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের যোগসূত্র বর্তমান। বঙ্গভঙ্গের চরিত্রদের দেখা গিয়েছে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে। দুয়ে মিলে ৪৭ বছরের ইতিহাস প্রমথনাথ পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন সে দিক থেকে আলোচ্য উপন্যাসদ্বয় স্বাধীনতা আন্দোলনের

উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত। প্রমথনাথ ইতিহাস সত্যের সঙ্গে সাহিত্য সত্যের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। উপন্যাসটি শুধু জ্বালাময়ী রাজনৈতিক দলিলই হয়ে ওঠে নি এর সঙ্গে জীবনরস যুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই।

এই উপন্যাসের সময়কাল হল বঙ্গভঙ্গের অবসান থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত। যে চারটি পন্থায় ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে লেখক তার তথ্য ভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন। প্রথমতঃ সশস্ত্র বিপ্লব ও সসৈন্য বিপ্লব। দ্বিতীয়তঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও চট্টগ্রাম অধিকার, তৃতীয়তঃ নেতাজীর ভারত অভিযান, চতুর্থতঃ গান্ধীজীর নেতৃত্বে নিরস্ত্র বিপ্লব। এই চারটি পথের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের হয়েছে উদয়।

উপন্যাসে দিনাজশাহীর সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে সুদূর মফস্বল ও কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের নরনারীকে নিয়ে উপন্যাসের কায়া নির্মিত। তাদের সুখ দুঃখ, আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগের কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

সামগ্রিক বিচারে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। উপন্যাস শিল্পের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সন্দেহ নেই কিন্তু তার আঙ্গিক কুশলতা শিল্পীকে যথার্থ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দেয়।

কালচেতনা

উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কালগত ঐক্য কতটা রক্ষিত হয় সে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালচেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

" জেনে এবং না জেনে আমরা একদিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে নিজের কালকে। " [৫]

উপন্যাস সময় নির্ভরশীল। সময়ের প্রয়োগ নৈপুণ্য একধরণের আর্ট — একে টাইম আর্ট বলা যেতে পারে। উপন্যাসে তাই পরিবর্তনশীল সময়ের প্রতিচ্ছবি দৃশ্যপট হয়। উপন্যাসে জীবনের সমগ্ররূপ ধরা পড়ে; ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ খন্ড খন্ড রূপ সময়ের প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত হয়। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সময়ের সার্থক প্রয়োগ নৈপুণ্যের উপর কাহিনী, চরিত্র ও জীবনদর্শন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একজন সার্থক শিল্পী কনটেন্টের সঙ্গে টাইমকে কতটা একাত্মতা করতে পেরেছেন তার উপর উপন্যাস 'প্রতিমা'র সৌন্দর্য নির্ভর করে। সে সময়কাল বর্তমান হতে পারে কিংবা দূর অতীতের বা কয়েকশত বছর পূর্বেকার হতে পারে। তবে অতীতের ঘটনা প্রবাহকে বর্তমানের সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপন শিল্পোৎকর্ষের লক্ষণ স্বরূপ।

সময়ের প্রয়োগরীতির নিরীখে ঘটনাকাল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনাকালকেই প্রকৃতকাল বলা হয়ে থাকে। আবার চরিত্র নির্মাণে কিংবা কাহিনী গ্রন্থনে কখনো কখনো প্রকৃতকাল থেকে অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় স্মৃতির সূত্রধরে তখন তা আপাতকাল হিসেবে বিবেচিত। আবার বর্তমানের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কোন চরিত্র অতীত স্মৃতিচারণ করলে তাকে মিশ্রকাল বলা হয়। তবে এই কালচেতনা কিছুটা জটিল হলেও উপন্যাস শিল্পের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশস্বরূপ। প্রতিটি ঔপন্যাসিক এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, বনফুল প্রত্যেক ঔপন্যাসিক সময়ের সার্থক প্রয়োগরীতির জন্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। প্রমথনাথ তাঁর উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে সময়ের প্রযুক্তি বিন্যাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথের প্রথম প্রবন্ধোপন্যাস 'দেশের শত্রু'তে কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাধারা দেখে আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে উপন্যাসটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ভারতের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র। পরাধীন ভারতের স্বরাজ লাভ, লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া, অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ ও নারী জাগরণের যে ইঙ্গিত উপন্যাসের বিষয় এতে প্রমাণিত হয় যে 'দেশের শত্রু' উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা।

'কোপবতী' উপন্যাসের ঘটনাকাল দুবছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতা থেকে গুডফ্রাইডের ছুটিতে বিমল তালবনীতে এসেছে এখানেও সময়ের প্রশ্ন। বিমল অর্ধ্বরাত্রে স্বপ্ন দেখেছে এক সুন্দরী নারীমূর্তি, পরদিন ভোরবেলায় শালফুলের গন্ধ, বেলা দশটায় হরি ডাক্তারের আগমন, বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণলিপিকে সময়ের উল্লেখ 'কাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা' সে দিন চৈত্রমাসের সংক্রান্তি, আকাশে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস সময় সন্ধ্যা' — এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সময়ের সঠিক প্রয়োগ হয়েছে। 'তারপর আরোও তিনমাস চলিয়া গেল' কিংবা 'সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি' ফুল্লরা ও বিমলের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাদের দাম্পত্য জীবনে মিলনমধুর পরিবেশ রচনা করেছে। প্রমথনাথ সমগ্র উপন্যাসে স্থান ও সময়পটের যোগসূত্র স্থাপন করে সময় ও ঘটনাকে গভীর তাৎপর্য দান করেছেন।

'পদ্মা' উপন্যাসের প্রকৃতকাল মাত্র দু বছর। এখানে কোন কালের দ্বন্দ্ব নেই, নরনারীর হৃদয় রহস্য উদ্‌ঘাটন উপন্যাসটির বিষয়। 'বড়দিনের ছুটিতে বিনয়ের কলকাতা থেকে আসা' 'ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি অনেক রাত্রে হঠাৎ বিনয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল' চরচিলমারীতে সেদিন আগুন লেগেছে মুসলমান পাড়ায় চারিদিকে আলো এই আলো উপন্যাসে ঘটনার

বিপ্রতীপতায় প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে। "সেদিন বাড়ির ভিতরে গাত্র হরিদ্রার বস্ত্রে সদ্যবিবাহিতা উৎফুল্লা পারুল অকাল বসন্তলক্ষ্মীর মত শোভা পাইতেছে।" — এখানে সময়ের নিরীখে নবদম্পতির মিলনের সম্ভাবনা দ্যোতিত হয়েছে।

'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীর সময়কাল ১২৫ বছর। মোটামুটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দ থেকে বঙ্গ ও ভারত বিভাগের প্রাককাল অর্থাৎ ১৯৪৫খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র নায়ক উদয়নারায়ণ পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছে বর্তমান কাল থেকেই তাই এটি মিশ্র কালের উদাহরণ। উপন্যাসটিতে কালের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। সামন্ততন্ত্রের বিলয় ও ইংরেজ কোম্পানী শক্তির উদয়ের ফলে দর্পনারায়ণের হাহাকার প্রতিফলিত। 'চলনবিল' উপন্যাসে সেদিন অক্ষয়তৃতীয়া দীপ্তিনারায়ণকে দীক্ষার দিন এই তিথিতে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার দর্পনারায়ণ ধুলোউড়ির কুঠি থেকে জোড়াদীঘিতে গিয়ে দশ বছর আগেকার ভগ্নপ্রায় দালান দেখেছে এটা মিশ্রকাল। তৃতীয় খন্ডে আধুনিক যুগের কর্মবিধিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসটির প্রকৃতকাল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্ন। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের বঙ্গদেশের বিশেষ করে কলকাতার ঐতিহাসিক কাঠামো যখন সতীদাহ প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। নবাগত ইংরেজদের আচার আচরণ রীতিনীতির সঙ্গে বাবু সমাজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন প্রভৃতি বিষয় প্রকৃতকালের। জোড়ামউ গ্রামের সহমরণের স্মৃতি রেশমীকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দিয়েছিল এ ঘটনায় আপাত কালের দৃষ্টান্ত।

'লালকেল্লা' উপন্যাসটির প্রকৃতকাল সিপাহী বিদ্রোহোত্তর শাহজাহানাবাদের ঘটনা। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে শাহজাহানাবাদের লালকেল্লার অসহায় বাদশা বাহাদুর শাহের সময়কালের ইতিহাস এর পটভূমি। প্রমথনাথ সম্রাট আকবর ও শাহজাহানের রাজত্বকালের

বর্ণনা দিয়েছেন যা আপাতকালের উদাহরণ। জীবনলালের তক্তিতে লেখা পিতার নির্দেশ সুখানন্দের পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বিধিনিষেধ মিশ্র কালের দৃষ্টান্ত। ক্ষমতাহীন বাহাদুর শাহের খেদোক্তি আপাত কালচেতনা এখানে বাহাদুর শাহ অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেছেন।

প্রমথনাথের কালচেতনার প্রমাণ মেলে ঐতিহাসিক পটভূমি নির্বাচনে। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের প্রকৃতকাল ১৯০০ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লেখক জানিয়েছেন রায়বাহাদুর কতৃক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বাস্তব ঘটনা আলোচ্য উপন্যাস রচনার প্রেরণা যা আপাতকালের উদাহরণ।

'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসটি ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ বছর সময়কালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ত্রিশ বছরই উপন্যাসটির প্রকৃতকাল।

সংলাপরীতি

সংলাপ হল উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের মুখের ভাষা। ঔপন্যাসিক চরিত্রকে জীবন্ত ও বাস্তব করবার জন্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সংলাপ ব্যবহার করেন। সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়। কোন পরিবেশে কি ধরণের সংলাপ যথাযথ তা ঠিক করে নেন ঔপন্যাসিক। যেমন 'পদ্মা' উপন্যাসের একটি সংলাপ —

" কঙ্কণ লক্ষ্মী দরজা খোলো -

কোনো শব্দ নাই

- আমি দোষ করেছি, মাপ কর, ক্ষমা কর, - বিনয় দরজায় আঘাত করিতে লাগিল।" [৬]

এখানে উপন্যাসের নায়ক বিনয়ের আর্তি প্রকাশিত হয়েছে। উপযুক্ত সংলাপ প্রয়োগে লেখকের মুন্সীয়ানা প্রশ্নাতীত।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে পরন্তপের স্বগত সংলাপ - " পরন্তপ মাটিতে অর্ধপ্রোথিত একটা নরকঙ্কালের উপর লাথি মারিতেছিল -

এই তো আমার উপযুক্ত শয্যা! নরকঙ্কালের শরশয্যা। আর দেরি নেই সময় হয়ে এল; পাতো বিছানা - আমি আসছি।" [৭]

অন্ধকার গুপ্ত কারাগারে হতভাগ্য পরন্তপের স্বগত সংলাপটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে চন্ডীখুড়োর সঙ্গে তিনু চক্কত্তির কলহ জমে উঠেছিল বারোয়ারী তলার বিচার সভায়। জেলেনি অপবাদে চক্কোত্তি উত্তেজিত হলে লাফিয়ে ওঠে চন্ডীবক্সী

" তবে রে শালা!" বলে ব্যাঘ্র ঝম্পে ঘাড়ে এসে পড়ে চক্কোত্তির । তার পরে দুজনেই নিজ নিজ কোটে গিয়ে হাপাতে থাকে । এখানে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করলেও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে হেনরি ও ব্রিজম্যান জীবনলালকে গীবন ভৈরবকে বেরব উচ্চারণ করে। যদিও স্নেহাত্মক নামের বিকৃতিসাধন স্যার হেনরি লরেন্সের এক মুদ্রা দোষ। তিনি বলেছিলেন —

বেরব , আমার কাছে রাখবার উদ্দেশ্য গীবনকে আমি **ADC** করে নেব — কারণ -

"I Wish to remain surrounded by smiling faces"

লেখক চরিত্রানুগ সংলাপ প্রয়োগে উপন্যাসের উৎকর্ষতা বাড়িয়ে তুলেছেন।

বাদশা বাহাদুর শাহ গালীবকে উদ্দেশ্য করে প্রশংসাসূচক উক্তি করেছে -

" বাহবা! বাহবা" আবার "বাহা বাহা!" এই সংলাপে বাদশাহী আমলের এক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে।

বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লোজেট সাহেবের মুখে বাংলা উচ্চারণটি বাস্তবসম্মত — সংলাপটি নবীন মুদিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে —

" তুমি টোমার সমষ্ট সম্পট্টি স্বডেশী স্কুল কলেজে ডান করিয়াছে ইহা কি সট্য।"

এখানে 'ত' কে 'ট', 'দ' কে 'ড' উচ্চারিত হয়েছে।

প্রমথনাথ উপন্যাসে স্থানে স্থানে চরিত্রানুগ আঞ্চলিক ভাষার সার্থক ব্যবহার করেছেন।

লেখকের উচ্চশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর সংলাপ ব্যবহারেও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের মুখের ভাষা -

" দো হাত্তা লড়াই করতে হবে আমাদের। ধৈর্য ধর বসু, ধৈর্য ধর, সময়ে সব হবে।"

প্রমথনাথ যথাযথ সংলাপ প্রয়োগ করে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। সংলাপ গুলিতে লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ এতে সন্দেহ নেই।

চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্য

কথাসাহিত্যে চরিত্রের রূপচিত্রণ পাঠক মনে প্রত্যক্ষতা দান করে। রূপবৈচিত্র্যের একটা দৃষ্টি গ্রাহ্য আবেদন পাঠকের মনে ছবির মত উদ্ভাসিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক প্রত্যেকেই উপমার মাধ্যমে কিংবা বিশেষণের সাহায্যে বিভিন্ন চরিত্রের

দৈহিক রূপের বর্ণনা সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে দিয়েছেন। চরিত্রের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য পাঠক মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলে । তবে কোন কোন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের রূপ বৈচিত্র্য বর্ণনার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন, বিশেষ করে অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । তবে প্রমথনাথ রূপবর্ণনার বৈচিত্র্য এনেছেন, তাঁর অঙ্কিত বিভিন্ন চরিত্রের রূপবর্ণনার স্বাভাবিকত্বও মৌলিকত্ব রয়েছে সন্দেহ নেই। প্রমথনাথ রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন সৌন্দর্য ও লৌকিক উপমা প্রয়োগে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

'কোপবতী' উপন্যাসের নায়ক বিমলের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

" বিরাট পুরুষ, দীর্ঘদেহ, লম্বিত বাহুদ্বয়, শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র শিথিল কেশ, সরস্বতীর শ্বেত লেখ পট্টের মত শুভ্র নিরঞ্জন ললাট, অপরাজিতার মত স্নিগ্ধ কোমল কৃষ্ণাভ চোখ দুটি।" — বিমলের দীর্ঘাকৃতি দেহ, শুভ্র ললাট ও স্নিগ্ধ চোখ বয়স যুবক তার মানসিক বিশেষত্ব হল সরলতা, সাহসিকতা ও তারুণ্যযুক্ত।

'পদ্মা'র কঙ্কণের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন তার গায়ের রং কালো, চোখের পাতায় দুটি রেখা, বয়স পনেরো ষোল । মানসিক বৈশিষ্ট্য ধৈর্য, সরলতা।

বনোয়ারীলালের বয়স চল্লিশের উপরে, হাসলে দুগালে দাগ ভেসে ওঠে, চোখদুটো অকারণে মিটমিট করে চোখে মুখে অশ্লীল ইসারার ছাপ তার নারীর প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টি, প্রতিহিংসা এই চরিত্রের বিশেষত্ব।

পারুলের বয়স ষোল থেকে কুড়ির মধ্যে অধরোষ্ঠ চাপা, মুখে মৃদু হাসি, চোখ দুটি চঞ্চল যেন জাগরণের স্বপ্ন, বসন্তের উদ্দাম বাতাস, এক কৌতূহল তার মধ্যে প্রকাশিত।

সর্বেশ্বরীর মাথাটা খাটো, মুখে হাসি; বেবির পাতলা গড়ন, বাদলের পেটটি ফুটবলের মত, অবিনাশবাবু দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত কপাল, মাংসল চিবুক উন্নত নাসিকা, মাথার চুল পাকা।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র উদয়নারায়ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ রোমশ ভুরু অচঞ্চল চোখ, ক্ষণে ক্ষণে অট্টহাস্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ইন্দ্রাণীর লাবণ্যময়ী স্নিগ্ধ অপূর্ব সুন্দর মুখ, সুঠাম উন্নত দেহ, চন্দ্রকান্ত ললাট, ভ্রুরেখা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, চোখদুটি ভাসমান পদ্মের মত, পাতলা অধরোষ্ঠ নিটোল বাহু করপদ্মের মত অঙ্গুলি, চিক্কণ কেশ, রক্তদহের রক্তকমল সদৃশ।

বনমালা বালিকা ও যুবতী বয়সন্ধিকালের সুকোমল তনু, রক্ত গোলাপের মত ঠোঁট, কুন্দকুঁড়ির মত দন্তমুকুল, পদ্মকুঁড়ির মত বাহু, চোখদুটি মাধুর্যপূর্ণ, সরল স্থিতধী চরিত্র। উদয়নারায়ণ তার নাম রেখেছেন ভাগীরথীর শ্বেতপদ্ম।

'চলনবিল' উপন্যাসের ঢাকুরায়ের বলিষ্ঠ দেহ, মাথার চুল সাদা, রং কালো, গোঁফদাড়ি কামানো সে কর্তব্যপরায়ণ চরিত্র।

বালবিধবা কুসমির মুখখানা বড় সুন্দর, গালদুটি পুরন্ত, কণ্ঠে রেখা, কচি গাব পাতার মত উজ্জ্বল রঙ, ঠোঁট দুটো তাজা করমচার মত ।

মুকুন্দ বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় টাক পাকা গোঁফ সে অত্যন্ত বিশ্বাসী।

রাজমিস্ত্রী সাবুর চেহারা বর্ণনা করেছেন লেখক যা আমাদের মনে প্রত্যক্ষতা দান করেছে।

" রোগা খিটখিটে চেহারা, চিবুকের উপর একগুচ্ছ পাকা দাড়ি, পাকা গোফ অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা, চোখের ভুরু মায় চোখের পাতার লোমগুলি অবধি পেকে গিয়েছে, পরণে একখানা ডুরে তবন, কাঁধে গামছা, ডানহাতে করনি।" [৮]

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের চন্ডী বক্সী ও তিনু চক্রবর্ত্তী দুজনেই সমান কৃশ, সমান দীর্ঘ ও দুজনেই হাঁপানির রোগী। চন্ডী বক্সী খল চরিত্র সে লোভী ও কলহপ্রিয়।

জগৎদাসের পেট, মুখ, চোখ সব গোল তার কথা সরল কিন্তু সরল তলোয়ারের মত

সাংঘাতিক। পঞ্চাননের ঘাড় বাঁকা, ন্যাড়ার মাথার চুল সাদা কালো।

রেশমী অপূর্ব সুন্দরী, শুভ্র গ্রীবা , সুঠাম দেহ , চোখদুটি রাগিনীর মত লুব্ধ নাগরাজের মত যৌবনদ্যুতি, বিদ্যুৎবহ্নি শিখার মতো চেহারা সে বুদ্ধিমতি, সাহসী।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিপুলদেহ, কাঁচা পাঁকা ভুরু, জ্বলন্ত টিকার মত চোখ, বাঁ পাঁ কিছুটা বিকল, মাথায় গুচ্ছবদ্ধ চুল , হাতে লাঠি অত্যন্ত ক্রোধী কিন্তু পন্ডিত ব্যক্তি।

রামমোহনের বিপুল চেহারা, উদার বক্ষ, প্রশস্ত পিঠ, যুগন্ধর স্কন্ধ, মুখ অনুসারে চোখ দুটি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল ও স্নেহভাবযুক্ত। সরল নাসিকার মাঝখানে একটু অতর্কিত উঁচু ।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের হেনরির প্রশস্ত কপাল,পাতলা সাদা পাকা দাড়ি, চোখদুটি সবসময় মাটির দিকে, সন্দেহ , অবিশ্বাস ও অপ্রসন্নতা মাখা চরিত্র।

জীবনলাল ছফুট উচু সবল দেহ রং ফর্সা সর্বদা প্রসন্ন মনোভাব।

পান্নার বয়স পঁচিশ, অকলঙ্ক শশীর মতো সে তার মুখের হাসির দাম দশহাজার টাকা তার গায়ের রঙ ইংলন্ডের রমণীর মত। সে নৃত্যগীত কুশল ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাস প্রিয় মহিলা।

প্রমথনাথ বিশী উপন্যাসে চরিত্রগুলির শারীরিক রূপের বর্ণনায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপূর্ব শিল্প কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এজন্য চরিত্রগুলো পাঠকমনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।

প্রেমভাবনা

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্রেম। কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক কি রাজনৈতিক কি আঞ্চলিক সমস্ত শাখাতেই প্রেম একটি মৌল বিষয়। তবে রাজনৈতিক উপন্যাসে

নারী প্রেমের স্থান অনেকটা গৌণ। পুরুষ ও নারীর আকর্ষণকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিকরা নানা রূপ অঙ্কন করে থাকেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখা যায় নারী প্রেম রাজ্যের পতনকে অনেক ক্ষেত্রে ডেকে আনে। প্রেমের একটা মহৎ আদর্শ আছে — আদর্শহীন অন্ধ প্রেম ব্যক্তিজীবনে ব্যর্থতা ডেকে আনে — আবার প্রেমের ক্ষেত্রে ত্যাগ আত্মনিবেদনে মহৎ প্রেমের আদর্শ উচ্চারিত হয়।

ত্রিকোণ প্রেমে কোন পুরুষের প্রতি দুই নারীর আসক্তি কিংবা এক নারীর প্রতি দুই পুরুষের আসক্তি বর্ণিত হয়। দুই নারী কিংবা দুই পুরুষের প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব মুখর চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বা প্রণয় প্রণয়ীর ক্রোধ, ঈর্ষা, ক্রূরতা, জিঘাংসা প্রভৃতি মানসিকতা তুলে ধরেন।

প্রেমের সঙ্গে সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্ন জড়িত থাকে। বিবাহের মধ্য দিয়েই সামাজিক স্বীকৃতি নিরুপিত হয়। বিবাহকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের প্রেমকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) প্রাক্‌বিবাহিত প্রেম; (খ) দাম্পত্য প্রেম (গ) বিবাহোত্তর প্রেম। সমাজে বিবাহোত্তর প্রেম নিন্দনীয়। প্রেমের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আবার সাহিত্যে দেহাতীত প্রেমও লক্ষ্য করা যায়। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব সাহিত্যে স্থান পাবার পর থেকে প্রেমের ক্ষেত্রে যৌনতা বিষয়টি যুক্ত হয়েছে আবার চেতনাপ্রবাহ প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে যৌনতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিকরা প্রেমের দ্বিমুখী গতির বর্ণনা দিয়েছেন (ক) একমুখী প্রেম (খ) পারস্পরিক প্রেম। একমুখী প্রেমের ক্ষেত্রে নায়ক নায়িকার প্রেমবোধে সমতা থাকেনা। আর পারস্পরিক প্রেমের অবস্থায় দুজনেরই প্রেমবোধ সমান বলে প্রেমের দান প্রতিদানে সমতা রক্ষিত হয়। প্রেমকে আরও দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) সফল প্রেম (খ) অসফল প্রেম। সফল

প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্ণতা ও অসফল প্রেমের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত কথাশিল্পীরা প্রেম মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন অসামাজিক প্রেমকে বিশেষ স্থান দেননি। কোন প্রেমচিত্রণে বিয়োগান্তক পরিণতি দেখিয়েছেন আবার কোথাও প্রেমের সফল চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নরনারীর প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন। তবে অন্যান্য কথাশিল্পীদের তুলনায় প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্যতা হল প্রমথনাথের উপন্যাসের প্রত্যেকটিতেই নায়ক কিংবা নায়িকার বিয়োগান্তক পরিণতি দেখিয়েছেন। অপর বৈশিষ্ট্য হল প্রমথনাথের কোন উপন্যাসেই সুখী দাম্পত্য জীবনের পরিচয় নেই। একমাত্র 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের অনবদ্য চিত্র তুলে ধরেছেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ। তবুও প্রেমের চিত্র অঙ্কনে লেখকের নৈপুণ্যের অভাব ঘটেনি। বলতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নায়ক নায়িকাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দেহাতীত প্রেমের প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। বিভিন্ন উপন্যাসে প্রমথনাথের প্রেমভাবনার স্বরূপটি প্রদত্ত হল ঃ -

রাজনীতিধর্মী প্রবন্ধোপন্যাস 'দেশের শত্রু'তে পিনাকবাবুর সঙ্গে সীতার প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বলাবাহুল্য পিনাকবাবুর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অন্যতম কারণ হল সীতার প্রতি প্রণয়াসক্তি। যদিও এই প্রেম পারস্পরিক প্রেমোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তথাপি এই প্রেম ছিল অসফল।

'কোপবতী' উপন্যাসেও প্রেম ছিল পারস্পরিক ফুল্লরা ও বিমলের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সমভাবে প্রাধান্য পেয়েছে বিমল ও ফুল্লরার প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে। নায়ক নায়িকার প্রেমের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। প্রেম ততক্ষণই আকর্ষণীয়, মোহযুক্ত ও রহস্যময় হয়ে ওঠে যতক্ষণ না সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। প্রেম বিবাহের

চরম পরিণতি, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার প্রত্যেকের নায়ক নায়িকারা প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এই প্রেমের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের যৌনতা সম্পর্কযুক্ত। তাঁরা দেখিয়েছেন প্রেম হয়েছে বলেই বিবাহ। বুদ্ধদেব বিবাহিত জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মিলনমধুর আবেশ সৃষ্টি করেছেন, প্রমথনাথ সেখানে দেখিয়েছেন বিবাহের মধ্যেই ঘটে প্রেমের অপমৃত্যু। বিমল ও ফুল্লরার প্রেমের সূত্র ধরেই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বিবাহোত্তর জীবনে দেখা দিয়েছিল মান অভিমান মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত। আপাত সফল প্রেম হলেও বিমলের প্রকৃতির (কোপাই) মায়াবী আকর্ষণে ফুল্লরাকেও পেলনা প্রকৃতিকেও হারাল।

প্রমথনাথ 'পদ্মা' উপন্যাসে যেভাবে প্রেমভাবনা উপস্থাপিত করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা থেকে স্বতন্ত্র। কামনা বাসনা যুক্ত ইন্দ্রিয় নির্ভর প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম বলে মেনে নেন নি। 'চোখের বালিতে প্রেমচিত্র অঙ্কনে সফলতা দেখাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের জগৎ পরিপূর্ণতার জগৎ। কিন্তু প্রমথনাথের প্রেমধারণা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেহজ কামনা বাসনার সঙ্গে যুক্ত। বিনয়ের সঙ্গে কঙ্কণের প্রেমের উন্মেষ আকস্মিক হলেও প্রেমের বৃন্তে দুটি কুসুম সমভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কলকাতায় শিক্ষাসূত্রে গিয়ে অধ্যাপক কন্যা পারুলের সঙ্গে গড়ে ওঠে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক। বিনয়, কঙ্কণ ও পারুল এই ত্রিভুজ প্রেমের ক্ষেত্রে পারুলের প্রতি প্রলুব্ধ হলেও সন্দেহপ্রবণতা ও মতানৈক্যের ফলে পারুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কঙ্কণের কাছে প্রত্যাবর্তন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিনয় ও পারুলের বিয়ের দিনে শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে কঙ্কণের টোপর সহ আগমন বিনয়ের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পারুলকে উপেক্ষা করে কঙ্কণকে অনুসরণ করে নৌকাযোগে চরচিলমারীর দিকে যাবার জন্য যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে পারভেঙে কঙ্কণের মৃত্যু ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করেছে।

'জোড়দীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে দর্পনারায়ণ পলাশী গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা বনমালাকে নারীদেহ ভোগ লালসার মূর্তপ্রতীক পরন্তপের হাত থেকে উদ্ধার করে বজরায় স্বপ্নদর্শনের পর বনমালার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দর্পনারায়ণ ও বনমালার নদীবক্ষে দাম্পত্যজীবনের কবিত্বময় উপলব্ধি লেখক নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। তবে রক্তদহের রক্তকমল স্বরূপ ইন্দ্রাণীর মুখছবি সে ভুলতে পারে নি।

'চলনবিল' উপন্যাসে পরন্তপ ও চাঁপার পরকীয়া প্রেম বিয়োগান্তক পরিণতিতে সমাপ্তি ঘটেছে। কুসমি ও মোহনের কিশোর প্রেমের চিত্র অঙ্কনে লেখক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' এ নবীননারায়ণ ও মুক্তামালার প্রেমের চিত্র ও তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র অন্যান্য উপন্যাস থেকে এক স্বাতন্ত্র্যতার দাবী রাখে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য ভাবযুক্ত প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জন ভালোবেসেছিল এলমাকে আকস্মিক এলমার মৃত্যুতে জন তার কবরে ফুল দিয়ে প্রেমের মর্যাদা দিলেও দ্বিতীয় প্রণয়ীর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। রেশমীকে সে ভালবেসেছিল তার সঙ্গে গড়ে তুলেছিল দেহজ প্রেম। ইন্দ্রিয়লালসায় ও সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ হয়ে রেশমীকে ধর্মান্তরিত করে বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিল সত্য কিন্তু রেশমীর আত্মাহুতির প্রাক্‌মুহূর্তে জনের হৃদয়ার্তি রেশমীকে প্রভাবিত করতে পারে নি। লেখক রেশমী জনের প্রণয় আখ্যানে নানা মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। অপরদিকে রামরাম ভালবেসে ছিল রেশমীকে — ধর্মান্তরিত হতে বারবার নিষেধ জানিয়েছে। আকস্মিক রেশমীর বিয়োগ বেদনায় রামরাম নিদারুণ যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে রেশমী রেশমী বলে চীৎকার করতে করতে নিভে গেল তার জীবন দীপ। সফল প্রেমের দৃষ্টান্ত আলোচ্য উপন্যাসে নেই। রামরামের দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে মান অভিমান প্রমথনাথের লেখনীতে বাস্তবোচিত হয়েছে।

'লালকেল্লা ' উপন্যাসে বাদশা বাহাদুর শাহ বেগম জিনৎমহলের দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা থাকলেও তা সন্তান বাৎসল্যের পরিচয়বাহী। তবে জীবনলালকে কেন্দ্র করে ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক সচেতন ভাবেই জীবনলালের জীবনে প্রথম যে প্রেমের উদয় হয়েছিল সে হল বাঈজী পান্নাবাঈ । তারপর তুলসীর সঙ্গে জীবনলালের প্রেমমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী রুমালী দেহ দিয়ে জীবনলালকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। ব্যর্থ প্রেমিক স্বরূপরাম তুলসীকে ভালবেসেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনলালের কাছে সে নিস্প্রভ। পিতৃপ্রদত্ত তক্তি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে জীবনলালের জীবনে আকস্মিক বাধার সৃষ্টি হলেও জীবনলাল জানতে পেরেছিল তুলসী খুনী সুখানন্দের কন্যা নয়। বহু টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়ে বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে তুলসীর আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক জীবনলালকে লেখক বাঁচিয়ে রাখেননি। হডসনের গুলিতে জীবনলালের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ জানতেপায় নি তুলসী । সে তার প্রিয়তমের প্রত্যাশায় ঘরে রঙীন আলপনা দিয়ে বিবাহের পিঁড়িতে চিত্রাঙ্কন করে বিবাহের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষায় দিন গুনছে । লেখক রুমালীর প্রেমের আর্তি তার আত্মনিবেদন ও জীবনলালের মৃতদেহের পাশে রুমালীর মৃতদেহ দেখিয়ে দুজনের প্রেমাবেগকে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রমথনাথের স্বদেশ প্রেমমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে প্রেমের বর্ণনার চেয়ে আত্মত্যাগ, মহৎ স্বার্থত্যাগ চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে সন্দেহ নেই । তবুও শুভ্রা, মলিনা, রাধা , রুক্মিণীর সংঘাতময় জীবন ও প্রথম তিন নারী চরিত্রের বিয়োগান্তক পরিণতি আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় প্রেমচিত্র অঙ্কনে লেখক যে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস শিল্পের একটি বিশেষ লক্ষণ হল মনস্তত্ত্বমুখিতা। প্রমথনাথের প্রতিভার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানবমনের রহস্য উদ্‌ঘাটন। একটি উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র উপস্থাপন করতে হয় প্রতিটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রধারার। প্রতিটি চরিত্রের আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ বিকর্ষণ, প্রত্যাশা ব্যর্থতা, ভাললাগা মন্দলাগা, উত্থান পতন ইত্যাদি মানব মনের অন্দরমহলের অভিব্যক্তি কুশলী কথাশিল্পীর নিপুণ তুলির স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মনস্তত্ত্বমুখিতা আধুনিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র ভাবী ঔপন্যাসিকদের উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিয়েছেন—

"ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ে প্রকটনে যত্নবান হইবেন"। আবার মানবচরিত্রের দ্বৈতসত্তা সম্পর্কে বলেছেন—

"সুমতি নামে দেবকন্যা এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয় ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'চোখেরবালি', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন',' গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত' মানিকের 'দিবারাত্রির কাব্য, 'চতুষ্কোণ','পদ্মানদীর মাঝি','পুতুলনাচের ইতিকথা', বুদ্ধদেবের 'লালমেঘ',' তিথিডোর',' গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', বনফুলের 'দ্বৈরথ', 'জঙ্গম','সপ্তর্ষি' প্রভৃতি উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। প্রমথনাথ উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।

প্রমথনাথের কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলোয় কথোপকথনে অবচেতন মনের বিশ্লেষণের অভাব ঘটে নি। 'দেশের শত্রু' উপন্যাসে পিনাকবাবুর স্বদেশ প্রেমের মধ্যে কামনা বাসনা

আপ্রাপনীয়কে পাওয়ার সুতীব্র বাসনা উপন্যাসে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক । সীতার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ইন্দ্রিয় নির্ভর হলেও রাজনৈতিক আবর্তে পিনাকবাবুর সক্রিয়তায় সীতার অভিমান ক্ষুব্ধ মানসিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে।

'কোপবতী' উপন্যাসে বিমল ও ফুল্লরার পূর্বরাগ অনুরাগ, আশা আকাঙ্ক্ষা বিমলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কোপাই এর তীরে কিংবা বনলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে নায়ক নায়িকার স্বর্গীয় প্রেমানুভূতির নীরব সাক্ষী শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি । প্রমথনাথ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে এই রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাদের বিবাহোত্তর জীবনের মান অভিমান আকর্ষণ বিকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কখনও সংলাপ মাধ্যমে, কখনো আত্মকথনে কখনো বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

'পদ্মা' উপন্যাসে কঙ্কণের ভালোবাসা, প্রেমানুভূতি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। কখন জলাশয়ের ধারে কখনো পদ্মাতীরে তাদের মান অভিমান আশা আকাঙ্ক্ষার বাণীতে মুগ্ধ হয়েছে দুই নায়ক নায়িকা। আবার নাগরিক প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রমথনাথ উপস্থাপন করে দুই নায়িকার বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন। নাগরিক প্রেমের অভিব্যক্তি অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত হলে কঙ্কণের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণে বিনয়ের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে চরচিলমারীতে । কঙ্কণের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে বিনয়ের নিবেদিত প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । আপন প্রেমের গভীর আর্তিতে উপেক্ষিত বিনয় মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রত্যাশায় হিমালয়ের রানী দার্জিলিং এ যাত্রা করেছে। কঙ্কণের অসামাজিক মাতৃত্বের আভাসে গ্রামীণ কুৎসা, বনোয়ারীলালের লুব্ধ কামনার মুহূর্তে জীবনযন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়েছে সে তবুও তার মধ্যে অস্তিত্ববাদ প্রধান হয়ে উঠেছে। আবার পারুলের সঙ্গে তার বিবাহের দিনে কঙ্কণের সাক্ষাৎ আবেগ আকুলতা ও বিষন্নতার নামান্তর । অবচেতন মনের অতীত স্মৃতিতে বিনয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। পূর্বস্মৃতির

সূত্র ধরে মনের অন্দর মহলে সূক্ষ্ম ঘাত প্রতিঘাত, আঘাত অনুরাগ, আশা নৈরাশ্যের দোলায় দোলায়িত হয়ে পারুলকে উপেক্ষা করে কঙ্কণের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছে। প্রমথনাথ এভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অভিনব কুশলতা পরিচয় দিয়েছেন।

'জোড়দীঘির চৌধুরী পরিবারে' ইন্দ্রাণীর প্রতি দর্পনারায়ণের রূপজ মোহের আকর্ষণ ঘটনাচক্রে ভিন্নদিকে মোড় নিয়েছে। বনমালাকে অন্ধকার জগৎ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বজরায় দর্পনারায়ণের স্বপ্নদর্শন ও বনমালার মধ্যে কল্যাণী নারীমূর্ত্তি দর্শন ক্ষণিকের এই উপলব্ধি ইন্দ্রাণীকে উপেক্ষা করে বনমালার প্রতি হৃদয় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। অথচ ইন্দ্রাণীর প্রতিচ্ছবি দর্পনারায়ণ ভুলে যেতে পারে নি। পরন্তপের সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধে জয়ী হয়েও পরন্তপকে আঘাত করেনি, এখানে তার অবচেতন মনে ইন্দ্রাণীর চন্দ্রকান্তা রূপ মনে পরেছিল। প্রমথনাথ দর্পনারায়ণের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অপরূপ ভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে ইন্দ্রাণীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উপস্থাপন করেতে লেখক ভোলেন নি। দর্পনারায়ণকে বিয়ে করতে না পেরে সে চিরকুমারী থাকতে চেয়েছে কিন্তু ঘটনা চক্রে দর্পনারায়ণের প্রতিহিংসায় ও তার প্রতি প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য পরন্তপকে স্বামীত্বে বরণ করেছে। তাদের দাম্পত্যজীবনে কোন প্রাণের আবেগ সৃষ্টি করেনি। চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যকে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে পরন্তপের সক্রিয়তা ইন্দ্রাণীর মনে আশার আলো জাগিয়ে তুললেও জোড়াদীঘি ও রক্তদহের লড়াইএ মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখকের কলমে শিল্পরূপ দান করেছে। তার মান অভিমান, বিবাহ, আভিজাত্য, প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা মনস্তত্ত্বসম্মত।

'চলনবিল' উপন্যাসে লেখক সুকৌশলে কিশোর কিশোরীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আলোকপাত করেছেন। মোহন ও কুসমির প্রেমের উদ্ভব, প্রেমের বিকাশের মধ্যে দিয়ে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কুসমি বিধ্বস্ত হলেও বৈধব্য প্রেমের উপলব্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

'অশ্বত্থের অভিশাপে ' নবীননারায়ণ ও মুক্তামালার প্রেম মনস্তত্ত্ব নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে রেশমীর আসক্তি, হতাশা, ঈশ্বরের অনুধ্যান, চন্ডী বক্সী ও মোতিরায়ের সক্রিয়তা তার মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটিয়েছে। জনকে ভালবেসে না পাওয়ার বেদনা তার দুঃখ বেদনার খন্ড খন্ড মুহূর্তগুলো চেতনার বিভিন্ন রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে । মোতিরায়ের গৃহে রেশমীর বিকারগ্রস্ততা নিরাবরণ চিত্র চেতনা প্রবাহ রীতির দৃষ্টান্ত।

রামরামের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে জনের সঙ্গে রেশমীর বিবাহ সম্ভাবনা ও খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষা গ্রহনকে কেন্দ্র করে। রেশমীর আত্মাহুতির দিনে রামরামের অন্তর্দাহ এবং মানসিক যন্ত্রণায় 'রেশমী' 'রেশমী' বলে তর লোকান্তরের ঘটনা সতীদাহের নির্মম দৃশ্য রামরামকে বেদনাদীর্ণ করে তুলেছিল, ঔপন্যাসিক রামরামের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিপুণ শিল্পীর তুলিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে পান্না, তুলসী, রুমালী, জীবনলাল, স্বরূপরাম, খুরশিদ জান, বাহাদুর শাহ, সুখানন্দ প্রত্যেকটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন। 'লালকেল্লা' উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রমথনাথের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তুলসী চরিত্রের অন্তর্মানস সূক্ষ্ম জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে । রুমালীর সঙ্গে প্রেমের প্রতিযোগিতায় তুলসী জীবনলালকে জানিয়েছে 'যে রুমালী ভাল মেয়ে নয়' রুমালীর মত ছলনার আশ্রয় নেয়নি সে। রুমালীর জীবনলালের প্রতি প্রেমনিবেদন তার আর্তি ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রুমালী ও তুলসী দুজনের প্রেম মনস্তত্ত্ব স্বতন্ত্রধারার। তুলসী প্রেমের সূত্রধরে জীবনলালের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয় নি। আর রুমালী বিবেকবোধে পরিচালিত হয় নি প্রবল ইন্দ্রিয় উপলব্ধিতে আকাঙ্ক্ষিত জীবনলালকে জোর করে আদায় করতে চায়।

জীবনলালের প্রেমমনস্তত্ত্বের নানা অবস্থার চিত্র প্রমথনাথ সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন।

'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনা মুখ্য উপজীব্য বলে প্রমথনাথ আত্মানুসন্ধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি । রুক্মিণী, শচীন, মলিনা, শুভ্রা, রাধা অরবিন্দ ভূপতি প্রভৃতি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে সর্বাত্মকভাবে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি।

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাহিনীর চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণ করেছেন। তবে লেখকের কলমে এই মনোবিশ্লেষণ কখনো সূক্ষ্ম কখনো তীব্রতা দান করেছে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা মূল্যবান মন্তব্য তুলে ধরছি —

" মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসঙ্গত নহে; তাহার অনেক অংশ , অনেক স্তর ; তাহার সদর অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তাছাড়া তর লীলা এত সূক্ষ্ম এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ।" [৯]

আবার প্রমথনাথ বিশী প্রেমমনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন -

" পূর্ণবয়স্ক নরনারীর প্রেম দুই পক্ষ হইতেই সক্রিয় ও সচেতন, তাহাতে মনের সঙ্গে মনের সংঘাত, বাসনার সহিত বাসনার সঙ্কট, তাহা লাভ করা সহজ নয়, রক্ষা করাও কঠিন। এই সংঘাতে সংঘর্ষে তীব্রতার, উত্তাপের, স্ফুলিঙ্গের ও দাবানলের সৃষ্টি হয়।" [১০]

মৃত্যু চেতনা

কথাসাহিত্যে মৃত্যু চেতনা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। যেখানে সমগ্র জীবনের চিত্র উপন্যাসের বিষয় সেখানে মৃত্যুতত্ত্বের একটা বিশেষ স্থান আছে। সাহিত্য রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে

ঔপন্যাসিকরা যথাযথভাবে মৃত্যুদৃশ্য তুলে ধরেন এটাও এক ধরণের সাহিত্যের কলাকৌশল বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মৃত্যু দৃশ্য দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র, শরৎ থেকে আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ বিভিন্ন চরিত্রের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা করে পাঠকমনে করুণার সঞ্চার করেছেন। প্রমথনাথের সাহিত্যেও মৃত্যুচেতনা গভীর তাৎপর্য বহন করেছে।

ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য কথাসাহিত্যে সাধারণ মৃত্যুকে চার ভাবে দেখানো হয়।

প্রথমতঃ কোন চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণাম রূপে মৃত্যুকে দেখানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ কোন একটি চরিত্রের উপযোগিতা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে চরিত্রের অপসারণের জন্য মৃত্যু দেখানো যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, প্রেমে ব্যর্থতা কিংবা সংসার জীবনের বিষময় পরিণতির হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য পলায়নীবৃত্তিরূপে মৃত্যুকে দেখানো যেতে পারে।

চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ঙ্করতায় মৃত্যু দৃশ্য দেখানো যেতে পারে।

'কোপবতী' উপন্যাসে বিমলের সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতার কারণ একদিকে ফুল্লরার প্রেম অন্যদিকে প্রকৃতিপ্রেম বিশেষ করে কোপাই নদী। বিমল ফুল্লরাকে জানিয়েছে কোপাই হল তার সতীন। এই দ্বৈতআকর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে কোপাইবক্ষে ঘটেছে তার সলিল সমাধি। তবে একধরণের বিকারগ্রস্ততা তাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে প্রমথনাথ এখানে কোন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। প্রকৃতির অনুষঙ্গে শান্তিলাভ করেছে বিমল। জলে ডুবে তার এই মৃত্যুঘটনা মূলতঃ নিয়তিবাদকে স্মরণ করার। বিমলের আকস্মিক মৃত্যু শান্তরসের সংবেদনবাহী হয়ে উঠেছে।

'পদ্মা' উপন্যাসে দুটি মৃত্যুদৃশ্য লেখক দেখিয়েছেন। প্রথম মৃত্যুদৃশ্যটি তারণদাসের অত্যুচ্চ তট থেকে পদ্মা বক্ষে ঝাঁপ দেয়া। কন্যা কঙ্কণের অসামাজিক মাতৃত্বের সংবাদ জানিয়েছিল

দুর্ধর্ষ এক চরিত্র বনোয়ারীলাল তারণদাসকে। ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে তারণদাস জানাল — " খেলা,খেলা, ডাক্তার সাহেব সব মিথ্যা। " কঙ্কণের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বার দুই বলিল - মায়ের তো মেয়ে , মায়ের তো মেয়ে।" [১১]

তারণদাসের এই মৃত্যু সাংসারিক বিফলতায় হতাশ হয়ে পলায়নী বৃত্তিরূপে সংঘটিত হয়েছে।

এছাড়া এই উপন্যাসে দ্বিতীয় মৃত্যুদৃশ্যে নিয়তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। কঙ্কণের মৃত্যু ঘটনা আকস্মিক। বিনয় শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে কঙ্কণকে নৌকায় ওঠার অনুরোধ জানাবার সময় পদ্মাতীরে যে জমিখন্ডে কঙ্কণ দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ পার ভেঙ্গে নিঃশব্দে তলিয়ে গেল। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর চরিত্রের অপসারণের জন্য লেখকের এই মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে স্বরূপের মৃত্যু ঘটনার পর দর্পনারায়ণের গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন উপন্যাস কাহিনীর গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে।

এছাড়া জোড়াদীঘির সঙ্গে রক্তদহের জমিদারে জমিদারে লড়াইএ বহুমৃত্যু সংঘটিত হয়েছে তবে বেঙার মৃত্যু বীভৎসরসের পরিচায়ক।

'চলনবিল' উপন্যাসে অর্ধোন্মাদ চাঁপার ধারালো অস্ত্রাঘাতে লম্পট পরন্তপের মৃত্যু চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি রূপে দেখা যায়। বিশ্ববিধানের অমোঘ শান্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষার্থে শিল্পী প্রমথনাথ পরন্তপের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখিয়েছেন এই মৃত্যু উপন্যাসে শিল্প সম্মত হয়েছে সন্দেহ নেই।

আবার দর্পনারায়ণের বাঁধ রক্ষা করতে গিয়ে বন্যার জলে ডুবে আকস্মিক মৃত্যুতে একটি মহৎ জীবনাদর্শের অবসান ঘটেছে। দর্পনারায়ণের মৃত্যু ট্র্যাজেডি লক্ষণাক্রান্ত। এখানে লেখক নিয়তিবাদকে প্রাধ্যান্য দিয়েছেন ।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে প্রলয়ঙ্করী ভূ মিকম্পে জোড়াদীঘির জমিদার নবীননারায়ণের কুল পুরোহিতের কুলদেবতার বিগ্রহ স্পর্শ করে মৃত্যু ঘটনা আকস্মিক ও নিয়তিবাদের পরিচয়বহ।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে সহমরণ উপলক্ষে একাধিক মৃত্যুদৃশ্য বর্ণিত হলেও কথাশিল্পী প্রমথনাথের কলমে দুটি করুণ মৃত্যু ঘটনা পাঠকমনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তারা হল রেশমী ও রামরামবসু। মোক্ষদার মৃত্যু দৃশ্যটিও গভীর তাৎপর্য দান করেছে। রামরামের আনা সেমিজ বেঁচে থাকতে ব্যবহার করে নি অথচ মৃত্যুর মুহূর্তে সেমিজ ও অন্তর্বাস পরিধান করেছে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারায় পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবকে গুরুত্ব দেবার জন্যই এই মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা।

রেশমীর মৃত্যু কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত, সহমরণে জ্বলন্ত চিতা থেকে পালিয়ে কেরীর আশ্রয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল এবং বেঁচে থেকে জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। নিরপরাধ বালবিধবা রেশমী একদিন আবার তাকে ঘিরেই জন, রামরাম, চন্ডীবক্সী, মোতিরায়ের আবির্ভাব তার জীবনে শান্তির পথ রচনা করে নি। নারীমাংসলোলুপ মোতিরায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণের চেয়ে বহ্নুৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছিল উপন্যাসের নায়িকা রেশমী। প্রমথনাথ রেশমীর মৃত্যুকে চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণাম রূপে তুলে ধরছেন। লেখক এখানে নিয়তিবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রামরামের মৃত্যুটিও রেশমীর মৃত্যুর অনুষঙ্গরূপে এসেছিল, রেশমীর আকস্মিক আত্মাহুতিকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মেনে নিতে পারে নি। সৌন্দর্যপিয়াসী রামরাম একদিন রেশমীকে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল জনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে রেশমীর ধর্মান্তর হতে নিষেধ করেছিল স্ত্রীর মৃত্যুর পর রেশমীর সৌন্দর্য

একদিন তার মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল সেই রেশমীর আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠদানের ব্যাপারে তার নিরুৎসাহ ও ধীরে ধীরে রোগশয্যায় শায়িত হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় একদিন গঙ্গার তীরে প্রকৃতির কোলে একটু শান্তির পথ খুঁজে পেতে চেয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে গঙ্গার তীরে সহমরণে অনিচ্ছুক একটি বালিকার আর্ত চীৎকার রামরামকে দারুণভাবে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সহমরণ থেকে সে বালিকাকে বাঁচাতে পারে নি, ঘরে ফিরে সেই রাত্রিতেই 'রেশমী রেশমী' বলে চীৎকার করে রামরাম পৃথিবী থেকে নিল চিরবিদায়। প্রমথনাথ রামরামের মৃত্যু দেখিয়েছেন সহমরণের প্রতিক্রিয়ারূপে। বীভৎস সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামরামের উদ্যোগ ঔপন্যাসিক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণামরূপে লেখক রামরামের মৃত্যু দেখিয়েছেন এবং তা শিল্পসম্মত হয়েছে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে মৃত্যুর ঘনঘটা অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে বেশী মৃত্যুদৃশ্যের উপস্থিতি। প্রেমের ব্যর্থতা জনিত কারণে এই উপন্যাসে মৃত্যু ঘটেছে দুটি চরিত্রের তারা হল স্বরূপরাম ও রুমালী। তুলসীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে স্বরূপরাম কোম্পানীর সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে লালকেল্লার প্রাচীর উড়িয়ে দেবার জন্য বারুদ নিয়ে প্রাচীর ধংস করতে গিয়ে বাদশার বিশ্বস্ত সৈনিক নয়নচাঁদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। আর রুমালী ভালবেসেছিল জীবনলালকে কিন্তু হডসনের গুলিতে জীবনলালের মৃর্ত্যু হলে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কোম্পানীর ইউনিয়ন জ্যাক লালকেল্লার দ্বার থেকে তুলতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায় রুমালী। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জীবনলালের মৃতদেহের পাশে রুমালীর মৃতদেহ পরে থাকে। মৃত্যুকালে দুই প্রেমিক প্রেমিকার পাশাপাশি মৃত্যুদৃশ্য দেখিয়ে তার প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ।

উপন্যাসের প্রারম্ভে জীবনলাল দেখেছিল একটি মৃত্যুদৃশ্য। কয়েকজনে মিলে শ্বাসরুদ্ধ করে একটি লোককে মেরে ফেলেছে সৎকার করতে গিয়ে গঙ্গাজল দেবার সময় মৃতদেহের মুখে দুটো আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখা গিয়েছিল, পরবর্তীতে জীবনলাল তক্তিতে লেখা নিজ পরিচয় জানতে গিয়ে বুঝতে পারে সেই খুনের নায়ক সুখানন্দ যার দুটো আঙ্গুলের অগ্রভাগ নেই। ঔপন্যাসিক এখানে রোমান্টিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন।

দুই পান্ডেকে বিদ্রোহী সন্দেহে কামানের মুখে বেধে উড়িয়ে দেয়া, সন্দেহভাজন শ্বেতাঙ্গ রমণীদের হত্যা করে তাদের লাশ বস্তাবন্দী করে তাঞ্জামে তুলে যমুনাবক্ষে নিক্ষেপ, এরূপ অজস্র মৃত্যুর মিছিল লালকেল্লা উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। সুখানন্দ ও অনুপ সিংকে পাশাপাশি চিতায় দাহ করা হয়েছে। দুজনেই খুনী, সুখানন্দ হত্যা করেছে অনুপ সিং এর পিতাকে, অনুপসিং জানের বদলে জান নিতে পঞ্চাশ বছর ধরে ছোরা হাতে ঘুরে বেড়িয়েছে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সুখানন্দ পন্ডিতকে হত্যা করেছে। এই মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনায় লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর চরিত্রকে সরিয়ে দিতে লেখকের এই মৃত্যুকৌশল বর্ণনা নিঃসন্দেহে শিল্পগুণ সম্পন্ন।

লালকেল্লায় খুব সম্ভব বাদশা বাহাদুর শাহ ও বেগম জিনৎমহলকেও খুন করা হয়েছে, লেখক সরাসরি এই মৃত্যুদৃশ্য দেখান নি। অতীতে তিন তিনটি বাদশা লালকেল্লায় খুন হয়েছেন। ঔপন্যাসিক সরাসরি বাদশা ও বেগমের মৃত্যুদৃশ্য না দেখালেও আভাসে ইঙ্গিতে এই করুণ পরিণতি আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তবে হডসনের গুলিতে জীবনলালের মৃত্যু আমাদের কাছে অনেকটা অপ্রত্যাশিত হলেও সিপাহী বিদ্রোহোত্তর শাহজাহানাবাদের অসংখ্য মৃত্যুর মিছিলে রক্তরঞ্জিত হয়েছে নীল যমুনার জল। খুব সম্ভব প্রমথনাথ ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যই জীবনলালের মৃত্যু ঘটিয়ে পাঠকমনে জীবনলালের প্রতি

সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন। জীবনলালের মৃত্যুর কারণ আমাদের অজানা নয়। হডসন তাকে গুলি করেছিল শত্রুপক্ষের লোকের সঙ্গে জীবনলালের সহানুভূতি জানাবার অপরাধে। প্রয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর চরিত্রের অপসারণ কৌশলরূপে জীবনলালকে হডসনকে দিয়ে গুলি করে মারলেন প্রমথনাথ বিশী। মৃত্যুটি নিঃসন্দেহে সঙ্গতিপূর্ণ ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। 'লালকেল্লা' উপন্যাসে মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনাটি কতটা মর্মস্পর্শী লেখক তার চিত্র তুলে ধরেছেন নিম্নলিখিত অংশটিতে —

" পথের দুদিকে ইতিহাসের শ্মশান, — সিরি, জাহাপনা, হাউজ খাস, লালকোট .... পথে পথিক নেই কেবল মৃতদেহ, গৃহে জীবিত নেই কেবল হতাহত, পল্লীতে স্বাভাবিক শব্দ নেই কেবল আর্তনাদ। ধনীর প্রাসাদে ধন নেই কেবল লুণ্ঠনাবশেষ, আর ছোট বড় কোন দোকানে পণ্য নেই, কেবল ভগ্নাবশেষ। কোথাও দীপে শিখা নেই, উনুনে অগ্নি নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জন, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জনশূণ্য পল্লীতে যদি কোথাও মনুষ্য থাকে তবে তারা প্রচ্ছন্ন, ক্ষুধিত শিশু আজ মাতৃস্তন আকর্ষণে বিরত। অধিক কি, মৃত জননীর স্তন আকর্ষণে অপ্রাপ্তদুগ্ধ শিশুটিও আজ ক্রন্দনে অসমর্থ। শব্দের মধ্যে , প্রাণের চিহ্নের মধ্যে কেবল বিজাতীয় কণ্ঠের হুঁশিয়ারী, ভারি জুতোর গটমট, কামানের গাড়ির গড়গড় আর মাঝে মাঝে বন্দুকের দুম দুম। একটা অতিকায় শকুন যেন শহর শাহজাহানাবাদের মৃতদেহটার উপরে উপবিষ্ট।" [১২]

— অতিকায় শকুন এখানে ভয়ঙ্করতার প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে সুশীল, মলিনা, শুভ্রা, অরবিন্দ, ভূপতি এদের মৃত্যু ঘটেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে। প্রমথনাথ এই মৃত্যুদৃশ্যগুলিও শিল্পসম্মত ভাবে দেখিয়েছেন। মৃত্যুচেতনা প্রকাশে লেখকদের সাফল্য প্রশংসাতীত।

উপন্যাস নির্মাণ শিল্পে ঘটনাগত ও সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনার ঐক্য

কাহিনীপ্রধান উপন্যাসে যেমন ঘটনার ঘনঘটা আবার চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে চরিত্র বৈশিষ্ট্য মুখ্য হলেও ঘটনাহীন নয়। উপস্থাপনার ঐক্য ও ঘটনাগত ঐক্য একজন কথাশিল্পীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এতে কোন সন্দেহ নেই। একজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস সাফল্যের পেছনে যে কয়েকটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ তন্মধ্যে আলোচ্য বিষয় মূল্যবান বলে মনে করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, বনফুল, নারায়ণ, সমরেশ প্রত্যেকটি কথাশিল্পী ঘটনাগত ও উপস্থাপনাগত ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। প্রমথনাথের উপন্যাসগুলিতে ঘটনাগত ও সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনার ঐক্যের অভাব ঘটে নি।

প্রমথনাথ বিশীর 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক যা লেখকের প্রথম জীবনের লেখা পিনাকবাবুর সঙ্গে সীতার প্রণয় সম্পর্ক, জগত্তারিনী ও নৃত্যগোপালের চিন্তাধারা, শ্যামনগরে সত্যাগ্রহের ঘটনা, ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করে সুকৌশলে হৃদয়বাবুর জয় ও সুরদাসবাবুর বেদনা উপন্যাসের মুখ্য ঘটনা। স্থান গত ঐক্য উপন্যাসে রক্ষিত হয়েছে কলেজষ্ট্রীট, শ্যামনগরের ও কলকাতার নিকটবর্তী ঘটনার ঐক্যের ব্যত্যয় ঘটেনি। সামগ্রিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা ঐক্য সৃষ্টি করেছে।

'কোপবতী' উপন্যাসে ঐক্যের লক্ষ্য রক্ষিত হয়েছে। বিমলের বাঘ শিকার, ডাক্তারের চিকিৎসা, পতিত পাবনবাবু ও ফুল্লরার আগমন, বিমলের স্বপ্নদর্শন ও ফুল্লরার সঙ্গে প্রেমের উন্মেষ, বনলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে বিমল ও ফুল্লরার অংশ গ্রহণ তাদের বিবাহিত জীবন, বিবাহোত্তর সংসার জীবনের প্রতি নির্লিপ্ততা, কোপাই নদীর উৎস সন্ধানের জন্য বিমলের যাত্রা, বিমলের

কোপাই নদীতে সলিল সমাধি, ফুল্লরার তালবনী ত্যাগ, মিতনের অনন্ত প্রতীক্ষা সব ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে আবার সামগ্রিক ঐক্যের পেছনে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায় নি।

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা' উপন্যাসে বনভোজন উপলক্ষে বিনয়, দীনেশ, মহীন্দ্র, প্রবীরের নৌকাযোগে চরচিলমারীযাত্রা, কঙ্কণের সঙ্গে হাঁস ফেরৎ দিতে বিমলের পরিচয়, বিমলকে আহারের আমন্ত্রণ, উভয়ের প্রেমানুরাগ, বিনয়ের কলকাতা যাত্রা, অবিনাশ বাবুর বাড়িতে আড্ডার আসর, পারুল ও বিনয়ের পূর্বরাগ, পারুলের প্রেম প্রত্যাখানে বিনয়ের রাজসাহীতে যাত্রা, কঙ্কণের অসামাজিক মাতৃত্বের সম্ভাবনা, বনোয়ারীলালের কঙ্কণকে বিবাহের প্রস্তাব, তারণদাসের মৃত্যু, কঙ্কণের নিশীথে পাওয়া, বিচারে কঙ্কণকে একঘরে করে রাখা, কঙ্কণের অসুস্থতা, বিনয়ের নৌকাযোগে চরচিলমারী যাত্রা, কঙ্কণের আঙিনা থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসা, দার্জিলিং যাত্রা ও পারুলের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ ও বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ, কঙ্কণের সঙ্গে বিনয়ের সাক্ষাৎ, পদ্মার ভাঙ্গনে কঙ্কণের সলিল সমাধি, পদ্মাতীরে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে বিনয়ের অবস্থান ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সুর পরিলক্ষিত হয়েছে। একদিকে 'পদ্মা' উপন্যাসে ঐক্যের লক্ষ্য গড়ে উঠেছে আবার সামগ্রিক উপস্থাপনার একটা ঐক্য উপস্থিত। আলোচ্য উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী হিন্দু মুসলমান কৃষকদের জীবনচিত্র প্রতিভাত হয়েছে।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে চৌধুরী পরিবারের জমিদারীর শুরু থেকে জমিদারীর বিলুপ্তিকে স্থান ও কালের পটভূমিকায় বিস্তৃত হয়েছে। কালের দ্বন্দ্ব উপন্যাসের মূল বিষয়। অসংখ্য চরিত্র ও ঘটনাধারা ঘনঘন পরিবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনীধারায় ঘটনার ঘনঘটা থাকলেও ঔপন্যাসিক সুকৌশলে ঘটনাগত ঐক্য স্থাপন করেছেন। কাহিনী বর্ণনায় রোমান্টিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রসহানির সৃষ্টি হয় নি।

জমিদার উদয়নারায়ণ রক্তদহের কর্ত্রী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দর্পনারায়ণের বিবাহের বন্দোবস্ত করলেও দর্পনারায়ণ স্বরূপের অস্থি গঙ্গায় বির্সজন দিতে গিয়ে বনমালাকে উদ্ধার করে বনমালাকে বিয়ে করে এই ঘটনায় কাহিনীর গতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। দর্পনারায়ণ ও বনমালা পদ্মাবক্ষে যখন বজরায় দিন কাটিয়েছে তখন উদয়নারায়ণের বজরা ডুবে গেলে সাঁতার কেটে দর্পনারায়ণের বজরায় আশ্রয় নেয় এই ঘটনার ঐক্য লেখক সুষ্ঠুরূপে বিন্যস্ত করেছেন। আবার ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরন্তপের বিয়ে, নারকেল কাড়াকাড়ি খেলা, বিজয়া দশমীর দিনে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে পরন্তপ ও দর্পনারায়ণের বিরোধ, বাজার লুঠের ঘটনা, রক্তদহ জমিদার বাড়ী আক্রমণ, পরন্তপকে গুপ্তকারাগারে নিক্ষেপ, ইন্দ্রাণীর চিঠি পেয়ে বনমালা কর্তৃক পরন্তপের মুক্তি, দর্পনারায়ণের সাত বছর জেল, উদয়নারায়ণের হাহাকার প্রভৃতি চমকপ্রদ ঘটনা বিন্যাসে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ অবধি নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে সামগ্রিক উপস্থাপনায় একটা পরিপূর্ণ প্রতিমা অঙ্কিত হয়েছে বলে পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপন্যাসটির একটা বিশেষ আবেদন ফুটে উঠেছে।

প্রমথনাথের চলনবিল উপন্যাসে ঐক্যের লক্ষ্য রক্ষিত হয়েছে। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পুত্র দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ধুলোউড়ির কুঠিতে। দর্পনারায়ণের সঙ্গে গ্রামের প্রধান ডাকু রায়ের ঠান্ডা লড়াই, পরন্তপের সঙ্গে ডাকুরায়ের সম্পর্ক, মোহন কুসমীর প্রেম, পরন্তপের মৃত্যু, দর্পনারায়ণের বন্যার জলে ভেসে যাওয়ার ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। উপন্যাস নির্মাণে লেখক ঐক্যের দিকে সচেতন থেকেছেন।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে দাঙ্গাহাঙ্গামা গ্রাম্য দলাদলি বনমালা ও নবীননারায়ণের নৌকাভ্রমণ, জ্ঞাতিহিংসার ঘটনা প্রবাহ, ভূমিকম্পে জোড়াদীঘির বির্পযয় ইত্যাদি ঘটনাগত ঐক্য লেখক নিপুণভাবে দেখিয়েছেন।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে রেশমীর জ্বলন্ত চিতা থেকে পালানো, জন রেশমীর প্রেম, মোতিরায়ের ভূমিকা, চন্ডীবক্সীর সক্রিয়তা, রেশমীর মদনমোহন মন্দিরে আরতি দর্শন, কেরীর বিদ্যালয় স্থাপন, রেশমীর আত্মাহুতি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকের অধ্যাপনা, রামরামের মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাকে লেখক ঐক্যসূত্রে গেঁথেছেন।

'লালকেল্লায়' জীবনলালের কামানের মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে রেসেলাদার পদে যোগদান, পান্নার সঙ্গে পরিচয়, সুখানন্দের পারিবারিক কাহিনী, ক্যালিবান ও জীবনলালের সম্পর্ক, বাহাদুর শাহের বিপর্যয়, বাদশা বনাম ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ, স্বরূপরামের মৃত্যু, রুমালী তুলসীর সঙ্গে জীবনলালকে কেন্দ্র করে কলহ, তুলসীর শাহজাদার হাত থেকে উদ্ধার, জীবনলাল ও রুমালীর মৃত্যু, বাদশা বেগমের বন্দীত্ব প্রভৃতি ঘটনাগত ঐক্য লেখক সঠিকভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

'বঙ্গভঙ্গে' শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, রুক্মিণীর বিয়ের ব্যাপারে জটিলতা, সুশীলের মৃত্যু, যজ্ঞেশ রায়ের মানসিক পরিবর্তন, শচীন ও রুক্মিণীর দাম্পত্য জীবনের ঘটনা সব মিলিয়ে একটি নিটোল ঐক্য সূত্রে গ্রন্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

'পনেরোই আগষ্টে' মলিনা, শুভ্রা, রাধার, সংঘাতময় জীবন, আত্মহত্যা, কারাবরণ প্রভৃতি ঘটনা লেখক ঐক্যসূত্রে গেঁথেছেন।

প্রমথনাথ উপন্যাস নির্মাণ শিল্পে ঘটনাগত ঐক্য ও সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনার ঐক্যকে শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন সে দিক থেকে লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত।

উপন্যাসের গঠনবিন্যাস

প্রমথনাথের উপন্যাসগুলির গঠনপরিকল্পনা কতটা শিল্পমন্ডিত মূল্যায়ন পর্বে তা আলোচনার

অপেক্ষা রাখে। কেননা সার্থক গঠন পরিকল্পনার উপরই ঔপন্যাসিকের শিল্পসিদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। **Eduin Muir** তাঁর **The Structure of Novel** গ্রন্থে গঠন বৈচিত্র্যের দিক থেকে **Dramatic Novel** ও **Character Novel** এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ঘটনার কার্যকারণ সূত্র ধরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং ঘটনাধারা থেকেই চরিত্রের বিকাশ ঘটে আবার চরিত্রও ঘটনাকে পরিবর্তিত স্তরে পৌঁছে দেয় **Dramatic Novel** এ । **Character Novel** এ মূল চরিত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য পার্শ্বচরিত্র ও ঘটনা উপস্থাপিত হয়। উপন্যাস শিল্পের গঠন কৌশলে জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে । গঠন কৌশলের পরিপাট্যের উপর প্লট ও চরিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে।

উপন্যাসের গঠনকে আবার নানাভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক কখনও তার বক্তব্যকে খন্ড বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। খন্ড বা অধ্যায়গুলিতে কাহিনীর প্রারম্ভে তার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে দুই বা ততোধিক উপকাহিনী যুক্ত হতে পারে। খন্ড বা অধ্যায়ের মধ্যে কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত থাকে। খন্ড বা অধ্যায়ের মধ্যে কাহিনীর বিশাল স্রোত প্রবাহিত হয় এবং পরিচ্ছেদে ছোট ছোট তরঙ্গের মত কাহিনী বিন্যস্ত হয়। আরও বৃহৎ উপন্যাসে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি ভাগকে আবার খন্ড বা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে পরিচ্ছেদগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়। আর এক ধরণের উপন্যাস দেখা যায় যেখানে খন্ড বা পরিচ্ছেদ থাকে না, কয়েকটি চরিত্রের জবানীতে কাহিনী উপস্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এই জাতীয় উপন্যাস।

আমাদের সমালোচিত দশটি উপন্যাসের গঠন বৈচিত্র্য নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

গঠন বিন্যাস

উপন্যাস	ভাগ সংখ্যা	খন্ড অধ্যায় বা পর্ব সংখ্যা	পরিচ্ছেদ সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা
'দেশের শত্রু'	—	—	১২	৮৮
'কোপবতী'	—	২ খন্ড	প্রথম খন্ডে ২৩ টি দ্বিতীয় খন্ডে ১৭ টি সর্বশেষে পরিশিষ্ট	২৩২
'পদ্মা'	—	৫ টি পর্ব	৪৭	১৯০
'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'	—	৭ টি খন্ড	৯৮	৩২৮
'চলনবিল'	—	১৮ টি খন্ড	পরিচ্ছেদ সংখ্যা নেই * * * এভাবে চিহ্নিত	২৫৭
'অশ্বত্থের অভিশাপ'	—	৮ টি খন্ড	৬০	৩১১
'কেরী সাহেবের মুন্সী'	—	৫ টি খন্ড	৯৩	৫১৮
'লালকেল্লা'	৩টি	প্রথম ভাগ ৩ টি খন্ড দ্বিতীয় ভাগ ৩ টি খন্ড তৃতীয় ভাগ ২ টি খন্ড	১১১	৪৮৮
'বঙ্গভঙ্গ'	—	—	৩৯ ও পরিশিষ্ট	২১৫
'পনেরোই আগষ্ট'	—	—	৭০ ও পরিশিষ্ট	৪৮৪

পূর্বোক্ত সারণী দেখে বোঝা যায় প্রমথনাথ বৈচিত্র্যময় গঠনবিন্যাস করেছেন। 'দেশের শত্রু', 'কোপবতী', 'বঙ্গভঙ্গ', ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে খন্ড ও অনুচ্ছেদের কোন নামকরণ করেন নি। 'পদ্মা' উপন্যাসের পাঁচটি পর্বের নামকরণ করেছেন যে গুলি যথাক্রমে চরচিলমারী, কলিকাতা, চরচিলমারী পুনর্বার, হিমালয় ও পদ্মাগর্ভে। প্রতিটি পর্বের নামকরণে তাৎপর্যতা দান করেছে। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের সাতটি খন্ডের নামকরণ করেছেন পূর্ব কথা, চৌধুরী বাড়ী, পলাশী, ইন্দ্রাণী, বনমালা, জোড়াদীঘি বনাম রক্তদহ ও উদয়নারায়ণ। 'চলনবিল' উপন্যাসের সতেরোটি অধ্যায়ের নাম যথাক্রমে পিতাপুত্র, চলনবিল, পূর্বসূত্র, ডাকাতি, পরন্তপের পূর্বকথা, পরন্তপ ও ডাকুরায়, এপক্ষ, ওপক্ষ, আর এক পক্ষ, গ্রামপত্তন, জোড়াদীঘিতে, শপথ, বাঁধ, অনুসরণ, পরিহাস, বানের মুখ ও বিলে মানুষ। নামকরণগুলি ব্যাঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে খন্ডভাগ করেছেন কিন্তু খন্ডগুলির নামকরণ করেন নি। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে প্রতিটি পরিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন, নামকরণগুলি তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ পূর্বোক্ত উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমী রীতির অনুসারী। 'লালকেল্লা' উপন্যাসের নামকরণ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে কখনও শাহজাহানের উর্দু কবিতার ছত্র কখনও সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে কখনও বর্ণনামূলক কখনও বিশ্লেষণাত্মক প্রবাহমান রীতিতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। গঠন বিন্যাসে চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনী উপস্থাপনে সংগতির অভাব ঘটে নি। উপন্যাসে গঠনগত শৈথিল্য নেই। ঘটনাপ্রবাহে যথাযথভাবে স্থানগত ও কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে এ ব্যাপারে লেখকের উপর কোন আভিযোগ নেই। তবে প্রমথনাথের উপন্যাসের একটা ত্রুটি হল পরিচ্ছেদগুলি সর্বক্ষেত্রে সমানুপাতিক হয়ে ওঠে নি। দৈর্ঘ্যের অসমতা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে প্রমথনাথের উপন্যাসে গঠনভঙ্গির দিকে থেকে কোন অসঙ্গতির সৃষ্টি করে নি।

চরিত্রচিত্রণ

মানবজীবনের সমগ্রতার অনুসন্ধান যদি উপন্যাসের মূল লক্ষ্য হয় সেক্ষেত্রে চরিত্র সৃষ্টির স্থান হল সবার উপরে। চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতার উপরেই ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপিত হয়। শুধু চরিত্রপ্রধান উপন্যাসেই নয় কাহিনী প্রধান উপন্যাসেও চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রবাহমান জীবনের ঘটনাধারাকে আশ্রয় করে যে সব কেন্দ্রিয় চরিত্র, মুখ্য ও গৌণ অজস্র নরনারীর আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত পাতায় পাতায় সেই সব চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাঠক মনে জেগে ওঠে সহানুভূতিবোধ। প্লট ও চরিত্র আপাত ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক গভীর।

সমারসেট মম্ টুর্গেনিভকে জানিয়েছেন ঔপন্যাসিকের মনে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা উদয় হলেই সেই চরিত্রটি হবে প্রাণবন্ত। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে যে চরিত্রটি রক্তমাংসে গড়া চরিত্র হয়েছে কিনা। শিল্পীর নিপুণ তুলিতে আঁকা চরিত্র যেন জীবন্ত মানুষের মতো কথা বলতে পারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতে পারে, সেই শিল্পীই শ্রেষ্ঠ শিল্পী যিনি চরিত্রের মনোগহনে প্রবেশ করতে পারেন। মনোগহনে প্রবেশের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কথাশিল্পী যখন চরিত্র সৃষ্টি করবেন তখন একদিকে থাকবে তার অভিজ্ঞতা, নিজে দেখা চরিত্রটিকে ভাবনা, কল্পনা ও অনুভূতির আলোকে আপন করে নেবেন এবং নিজের চরিত্রকে সকলের চরিত্ররূপে তুলে ধরা। উপন্যাসে জটিল চরিত্রের চেয়ে জটিলতাহীন কমিক চরিত্রই বেশী থাকবে। চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখকের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হবে।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার চরিত্র সৃজন দক্ষতা কতটুকু তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রমথনাথ অভিজ্ঞতার শিল্পী - আপন অভিজ্ঞতার আলোকে যেমন

তিনি বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তেমনি রোমান্টিক প্রীতি বশে অতীত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে কখনও মোগল যুগের বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপন করেছেন আবার কালের দ্বন্দ্বের রূপকল্পে জমিদার চরিত্র অঙ্কন করেছেন আবার কখনও পল্লীবাংলার সাধারণ জীবনের চিত্র ও স্বদেশ প্রেমিকদের আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়েছেন অজস্র চরিত্র সৃষ্টি করে।

প্রমথনাথ বহু চরিত্রের স্রষ্টা। 'দেশের শত্রু' থেকে 'পনেরোই আগষ্ট' পর্যন্ত কেন্দ্রীয়, মুখ্য ও গৌণ চরিত্রগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে শ্রেণীচরিত্রের শিল্পমূল্য বিচারের দিকে এগিয়ে যাব ঃ

(ক) উচ্চবিত্ত শ্রেণী - বাদশা, শাহজাদা।

(খ) জমিদার শ্রেণী।

(গ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানা পেশায় নিযুক্ত।

(ঘ) ব্যবসায়ী শ্রেণী।

(ঙ) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

(চ) দরিদ্র শ্রেণী।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে একনজরে শ্রেণী চরিত্রগুলি তুলে ধরছি যারা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে -

বাদশা - বাহাদুর শাহ।

শাহজাদা - আবুবক্কর।

বাদশার সঙ্গী - গালিব, সুখানন্দ, আসকারী।

বেগম - জিনৎমহল।

জমিদার - উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নবীননারায়ণ, কীর্তিনারায়ণ, ইন্দ্রাণী, পরন্তপ।

সেনাবিভাগে নিযুক্ত - জীবনলাল, স্বরূপরাম, নয়নচাঁদ, ব্রিজম্যান, হডসন, গুরুবচন, নিকলসন।

অধ্যাপক - উইলিয়াম কেরী, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রমানাথ বাচস্পতি, সুরেন্দ্রনাথ, শচীন, অবিনাশ, সারদা ভট্টাচার্য।

শিক্ষক - ভট্টাচার্য পন্ডিত, বাণীবিজয়, অবিনাশ, শরৎচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তি - রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেব, গান্ধীজী, অরবিন্দ, নিবেদিতা।

ছাত্র - বিমল, বিনয়।

ব্যবসায়ী - ভজহরি, জগু, নবীন।

বাবু - মোতিরায়।

কৃষক - করিম।

সিপাহ্সালার - বখৎ খাঁ, কুলি খাঁ।

পোষ্টমাস্টার - তারণদাস।

ডাকাত সর্দার - বেণীরায়, ডাকুরায়, পরন্তপ।

রাজনৈতিক কর্মী - শচীন, সুশীল, ভূপতি, অরবিন্দ, রমণী, পিনাক, ব্রতেন্দ্রনাথ, সুরদাস।

ম্যাজিষ্ট্রেট - ক্লোজেট, ডোভার।

বৈষ্ণবী - সৌদামিনী।

উকিল - তারিনী, তারাচরণ, সারদা, হরিপদ।

পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট - মিঃ মজুমদার, মিস ফ্লোরা।

ইংরেজ - টমাস, উইলিয়াম কেরী, জন।

কালেক্টর - মিঃ বার্ড।

পুরোহিত - মানিক চক্রবর্ত্তী, তিনু চক্রবর্ত্তী, চন্ডীবক্সী।

ভৃত্য - মিতন, মুকুন্দ, ন্যাড়া।

লাঠিয়াল - আবেদ আলি, রামভুজ, গফুর।

রাজমিস্ত্রী - সাবু, জহিরুল্লা।

জমিদার পত্নী - বনমালা, ইন্দ্রাণী, মুক্তামালা।

জননী চরিত্র - নিস্তারিণী,সুলেখা, সর্বেশ্বরী, অম্বিকা, ক্ষেন্তবুড়ি।

বাঈজী - খুরশিদ জান; পান্না।

দুধ বিক্রেতা - রুমালী।

পরিচারিকা - চাঁপা, ভুতিবুড়ি।

উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ঃ-

দেশের শত্রু - সুরদাসবাবু।

কোপবতী - বিমল, ফুল্লরা।

পদ্মা - বিনয়, কঙ্কণ।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার - উদয়নারায়ণ, প্রতিনায়ক দর্পনারায়ণ, প্রতিনায়িকা বনমালা।

চলনবিল - দর্পনারায়ণ, প্রতিনায়ক মোহন, প্রতিনায়িকা কুশমি।

অশ্বত্থের অভিশাপ - নবীননারায়ণ, মুক্তামালা, কীর্তিনারায়ণ, রুক্মিণী।

কেরী সাহেবের মুন্সী - রামরাম বসু, জন, রেশমী।

লালকেল্লা - জীবনলাল, তুলসী, রুমালী।

বঙ্গভঙ্গ - যজ্ঞেশ রায়।

পনেরোই আগষ্ট - শচীন, রুক্মিণী।

নায়ক নির্মিতিতে প্রমথনাথ 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' ব্যতীত অন্যান্য উপন্যাসের নায়ক করেছেন সাধারণ স্তরের মানুষকে । উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নবীননারায়ণ অ্যারিষ্টটল কথিত ট্র্যাজেডির নায়ক হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কথাসাহিত্যে সাধারণ স্তরের মানুষরাই নায়কের পর্যায়ভুক্ত। সুরদাস, বিমল, বিনয়, রামরাম, জীবনলাল, যজ্ঞেশ, শচীন এরা প্রত্যেকেই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত মানুষহয়েও তারা নায়কের পর্যায়ভূক্ত। প্রমথনাথ 'লালকেল্লা'র মত উপন্যাসের নায়ক নির্বাচন করেছেন কোম্পানীর রেসেলাদার একজন সাধারণ স্তরের সৈনিক। বিমল ও বিনয় তারা দুজনেই ছাত্র হয়েও নায়কের মর্যাদা পেয়েছে। 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে রামরাম কেরীর মুন্সী মাত্র পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক। তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, বনফুল, সমরেশ বসু প্রত্যেকেই উপন্যাসে সাধারণ শ্রেণীভূক্ত মানুষকে নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

সৃষ্টিকর্মের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার এজন্য প্রমথনাথ তিল তিল করে চরিত্রগুলিকে নানা রং এর সমাহারে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। চরিত্রসৃষ্টির নিপুণ শিল্পী প্রমথনাথের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান আছে। মানুষের প্রতি উদার সহানুভূতি ও মমত্ববোধের গুণে প্রমথনাথের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। তাঁর মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি গভীর জীবনবোধের পরিচায়ক। শুধু মাত্র সৌন্দর্যস্রষ্টার রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেন নি কিংবা শুধুমাত্র শিল্প সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র যেমন একদিকে আর্দশবাদী চরিত্র অন্যদিকে অত্যাচারী, লোভী, স্বার্থপর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ষড়যন্ত্রকারী চরিত্রসৃষ্টিতে অদ্ভূত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মানবিকতার উদার মহৎ শঙ্খধ্বনি বেজে উঠেছে তাঁর সৃষ্ট অজস্র চরিত্রে যা আমাদের শুভবোধ জাগিয়ে তোলে। তাঁর সৃষ্ট কুৎসিত,

বিকৃত চরিত্রগুলিকে তিনি নির্মম আঘাতে জর্জরিত করেন নি আঘাতকরেছেন তাদের নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিককতাকে। রাজাবাদশা থেকে শুরু করে একজন সাধারণ ভৃত্য পর্যন্ত প্রমথনাথের লেখনীর আন্তরিকতার কোমল স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পী হিসেবে প্রমথনাথের মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই।

প্রমথ সাহিত্যে যে চরিত্রগুলি স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে 'লালকেল্লা'র বাদশা বাহাদুর শাহ চরিত্রটি মোঘলযুগের সর্বশেষ বাদশা ক্ষমতাহীন দোলাচলচিত্ত ও তার অসহায়তাকে অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের কলমে বাদশা চরিত্রটি প্রানহীণ হয়ে ওঠে নি। কোম্পানী শক্তির সঙ্গে বাদশার সৈন্য শক্তির পরাজয়ে বাদশার মর্মান্তিক বেদনাকে লেখক মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

বেগম জিনৎমহলের সক্রিয়তা বাদশার সঙ্গে কথোপকথনে তার সন্তান বাৎসল্যকে লেখক অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রের মুখে যে কথাগুলি বসিয়েছেন তা অসঙ্গতির সৃষ্টি করে নি। বাদশা পুরনো কেল্লায় যেতে চাইলে জিনৎমহল উত্তর দিয়েছেন — "পুরনো কিল্লাতে গেলেই কি সে নাম খুচবে বাদশা ওকিল্লাও তো বাদশা হুমায়ুনের তৈরী।" ছোট্ট এই সংলাপে বেগমের ব্যক্তিত্বকে বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না।

বাদশার একান্ত সঙ্গী কবি মীর্জা গালিব, সুখানন্দ ও আসকারী প্রত্যেকেই বাদশার গুণগ্রাহী। কবি মীর্জা গালিবের প্রতি লেখকের দুর্বলতা ও সহানুভূতি ছিল বেশি। চরিত্রটিকে লেখক অত্যন্ত দরদ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। গজলরচয়িতা গালিব তক্তপোষে বসে তাল ঠুকে গজল গাইছে -

"আসমানে মেঘ নাই, দরিয়ায় জল,
আঁখির পাণিতে মোছে আঁখির কাজল।"

সুখানন্দ পন্ডিতের সঙ্গে আলোচনাক্রমে গালিব জানতে পেয়েছে তুলসী সুখানন্দের পালিত কন্যা। সুখানন্দের কন্যার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পাগলার মত হলে টাকা দিয়ে কিনে এনে স্ত্রীকে কোলে তুলসীকে তুলে দিয়েছিল। তুলসী অপহৃত হবার সংবাদ জেনে গালিব গুনগুন সুরে গজল আবৃত্তি করেঃ

" কুড়িয়ে পেলাম গোলাপ কুঁড়ি গাছের তলে
কুড়িয়ে পেলাম মুক্তা অমূল অতল জলে।
আকাশ পথে স্বপন বুড়ী
কুড়িয়ে পেল তারার নুড়ী,
কুড়িয়ে পাওয়া জুড়িয়ে দিল সব গরলে ।।"

পাওনাদার তাগাদার জন্য এলে গালিব হেসে বলত - " পাওনা চুকিয়ে দিলেই তো আর আমার গরিবখানায় তোমার দেখা পাওয়া যাবে না, " অর্থহীন গালিব তার আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্য দামী রেশমী ও পশমী পোষাক ব্যবহার করত। লেখকের কলমে চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

'লালকেল্লা'র সুখানন্দ পন্ডিত বাদশার খাস জ্যোতিষী একান্ত বাদশার গুণগ্রাহী। স্ত্রীর অনুরোধে তুলসীকে পালিত কন্যা রূপে গ্রহণ করে সে। অতীতে খুনের সঙ্গে জড়িত থেকে সে তার হাতের দুটি আঙ্গুল হারিয়েছে। সে তার নরঘাতক পরিচয় আড়াল করে পন্ডিত হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। তুলসীর প্রতি সন্তান বাৎসল্য, জীবনলালের সঙ্গে তুলসীর বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবনলালের পিতার লেখা চিঠি। খুনের বদলে খুন করতে অনুপসিং তার অনুসন্ধান করে অস্ত্রাঘাত করে ফেলে মুমূর্ষু অবস্থা জীবনলালকে জানিয়ে যায় তুলসী তার পালিত কন্যা। লেখক খুনী সুখানন্দ চরিত্ররূপায়ণে রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছেন ফলে

চরিত্রটি অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে।

'লালকেল্লা'র শাহজাদা আবুবক্কর চরিত্রটির অমিতাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সুরা নারীতে আসক্তি প্রভৃতি স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের শেষে আবুবক্করের ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করেছে। তুলসীর সতীত্ব হরণ করতে গিয়ে অসহায় তুলসীর আঁচল ধরে টান দেয় - " অনেক ছেনালি হয়েছে, নাও এখন ওঠো।" লেখক আবুবক্করের পৈশাচিক প্রবৃত্তির দিকটি তুলে ধরেছেন সার্থকভাবে।

প্রমথনাথের লেখনীতে জমিদার চরিত্র অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের উদয়নারায়ণ চরিত্রটির প্রতি লেখকের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে। উদয়নারায়ণ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর সময়কাল থেকেই চৌধুরী পরিবারের জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অশীতিপর বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের জন্ম হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের পঁচিশ বছর আগে। পৌত্রবৎসল সাহসী, পরিহাস রসিক নায়কচরিত্রের দ্বৈত সত্তা একদিকে নীরবতা - অপরদিকে মাঝে মাঝে অট্টহাস্যের বিরল দৃষ্টান্ত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে উদয়নারায়ণ চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন -

" উদয়নারায়ণের বীরত্বে মাঝে মাঝে অট্টহাসি দ্বারা খন্ডিত মৌন গাম্ভীর্য ও অন্দরে আস্ফালনের মধ্যে পর্যবসিত - ইতিহাসের চাকা ঘুরাইবার মত শক্তির উৎস তাহার কোথাও দেখা যায় না।" [১৩]

পুত্র কন্দর্পনারায়ণের প্রতি তার সদ্ভাব না থাকলেও পুত্রের মৃত্যুর পর পৌত্র দর্পনারায়ণের প্রতি স্নেহের অভাব ছিল না উদয়নারায়ণের। রক্তদহের রক্তকমল স্বরূপ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পৌত্রের বিবাহের উদ্যোগ জমিদারী আভিজাত্যের পরিচয়বহ। কিন্তু ঘটনাক্রমে বনমালাকে বিবাহ করলে পৌত্রকে গৃহে প্রবেশ করতে দেয় নি। কিন্তু পৌত্রের বাৎসল্যের জন্য পদ্মায়

বজরায় করে সে খোঁজ করেছে তাদের। দর্পনারায়ণকে জানিয়েছেন -

" আমার নাত বৌকে গরীবের মত রাখার তোর কি অধিকার। " [১৪]

রক্তদহের জমিদার বাড়ী আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দর্পনারায়ণের জেল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ঘটনায় উদয়নারায়ণ বিধ্বস্ত। অথচ অতীত ঐতিহ্যবাহী চন্ডীমন্ডপে দুর্গাপূজো, বহু নিমন্ত্রিত অতিথি, যাত্রাপালা কালের গতিতে সব বন্ধ হয়ে যায় উদয়নারায়ণ তা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারে নি। মায়ের কাছে জানিয়েছেন তার হৃদয়ের আর্তি।

উদয়নারায়ণের জীবনের অভিমান চিরনিরুদ্ধ বেদনায় জীবনসত্য প্রকাশ করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের জমিদার দর্পনারায়ণ চৌধুরী চরিত্রটি প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। টুকরো টুকরো নানা সিচুয়েশন সৃষ্টি করে সমগ্র চরিত্রটিকে লেখক পূর্ণরূপ দিতে পেরেছেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রতিনিধি দর্পনারায়ণ। মধ্যযুগের ভাবধারায় সে স্বরূপ সর্দারের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে গিয়েছে আধুনিক যুগ প্রতিনিধিরূপে পরন্তপের তাবু থেকে বনমালাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণ কন্যা বনমালাকে বিবাহ করেছে। লেখক উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন - " দর্পনারায়ণের বিবাহকে যুবকের খেয়াল বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইবেন এই ঘটনায় গল্পের মোড় ফিরিয়া গেল। " তবে বনমালাকে বিবাহ করেছে স্বতঃউৎসারিত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রেরণায় পারিবারিক বিদ্রোহের বশবর্তী হয়ে নয়। উদয়নারায়ণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে বনমালাকে নিয়ে পদ্মাবক্ষে বজরায় চেপে দিন অতিবাহিত করেছে আবার উদয়নারায়ণের আন্তরিকতায় প্রত্যাবর্তন করেছে জোড়াদীঘিতে। চৌধুরী বাড়ীর দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে পরন্তপের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অসিযুদ্ধে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু সুযোগ পেয়েও পরন্তপকে হত্যা করেনি। ইন্দ্রাণীর প্রতি ক্ষীণ দুর্বলতাই হয়তো

এর কারণ। জোড়াদীঘির সঙ্গে রক্তদহের সংঘর্ষে সে নেতৃত্ব দিয়ে পরন্তপকে বন্দী করে রেখে দিয়েছে গুপ্তকারাগারে। নাটোরের ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্ড সাহেব পরন্তপকে বেআইনীভাবে বন্দী করে রাখা ও বেআইনী দাঙ্গার অভিযোগে দর্পনারায়ণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও সাত বছর রাজসাহী জেলে তাকে কাটাতে হয়েছে। দর্পনারায়ণের জমিদারী আভিজাত্য, সাংগঠনিক প্রতিভা, বীরত্ব, পত্নীপ্রেম চরিত্রটিকে মহত্ত্বতা দান করেছে। তার বিরুদ্ধে প্রজাদের কোন আভিযোগ নেই। দর্পনারায়ণের উদারতা, বদান্যতা, দয়াশীলতা প্রভৃতি মানবিক মহৎগুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

'চলনবিল' উপন্যাসের নায়ক দর্পনারায়ণ আধুনিক কালোপযোগী গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। ধুলোউড়ির কুঠিতে আশ্রয়, ডাকুরায়ের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই, ডাকাতদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম, সন্তান দীপ্তিনারায়ণের প্রতি বাৎসল্য পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে তার রোদন, বাঁধ নির্মাণে তার সক্রিয়তা ও বন্যার প্রভাবে বাঁধকে রক্ষা করবার প্রয়াস ও মৃত্যুঘটনা চরিত্রটিকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করেছ। দর্পনারায়ণের কর্তব্যপরায়ণতা এক মহত্ত্বতা দান করেছে।

'চলনবিলে'র অধ্যায়ে শিশু ও কিশোর রূপে উপস্থাপিত দর্পনারায়ণের পুত্র দীপ্তিনারায়ণ চরিত্রটি স্নিগ্ধ কৌতুক ও বাৎসল্য রসের মাধুর্য বিস্তার করেছে। জীবনশিল্পী প্রমথনাথ স্নিগ্ধ মধুর জীবন দৃষ্টিতে দীপ্তিনারায়ণের উপলব্ধি আলোকরশ্মির মতো আবির্ভূত করেছেন। শিশু দীপ্তিনারায়ণের ভাঙা ভাঙা কথা 'ল' কে 'য়' উচ্চারণ তার কৌতুহল প্রবণতা শিশু সুলভ মানসিকতার প্রতিফলন। উড়ন্ত হংসবলাকা দেখে -

" বক মামা ফুল দে, বকমামা ফুল দে"। তার দশনখের দান দেখিয়ে বলে দেখো বাবা কত ফুল। সে ফুলকে 'ফুয়' উচ্চারণ করে।

দীপ্তিনারায়ণ যখন কৈশোরে পদার্পণ করে তখন তাদের প্রকৃত শত্রুকে চিনিয়ে প্রতিহিংসা

চরিতার্থ করতে দায়িত্ব ন্যস্ত করে দর্পনারায়ণ। দীপ্তিনারায়ণ বলিল -

" বাবা, তোমার কথা মনে থাকিবে। যদি আমার শক্তি হয় তবে পরন্তপরায়কে দন্ড দেব - আর যদি শক্তি না হয়, তবে অন্তত রক্তদহের জমিদার বংশকে কখনো ক্ষমা করব না, তারা যে আমার . . । পরে সংশোধন করিয়া বলিল - আমাদের বংশের শত্রু একথা কখনো বিস্মৃত হব না। "

এই বালককে প্রতিহিংসা ব্রতে দীক্ষিত করাই দর্পনারায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রমথনাথের শিশুপ্রীতির নিদর্শন আলোচ্য চরিত্রটি। সংলাপ ও মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র পরন্তপ চরিত্রটি যেমন রোমান্স রাজ্য থেকে আমদানি করা সে বাংলাদেশের বেপরোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রথমে মুর্শিদাবাদের তেমাথা গ্রামের নিঃস্ব প্রায় জমিদার, পরে রক্তদহের জমিদার কন্যা ইন্দ্রাণীর স্বামী। উপন্যাসে পরন্তপকে লেখক উপস্থাপিত করেছেন পলাশীর পর্বের একাদশ অধ্যায়ে যখন মদ্যপ অবস্থায় বনমালাকে তাবুর মধ্যে শ্লীলতা হানির চেষ্টা করেছিল। নারীমাংসলোলুপ নীতিজ্ঞানহীন বেপোরোয়া এই চরিত্রটির উপস্থাপনা ঊনবিংশ শতকের সমাজজীবন প্রসূত হয়ে ওঠে নি। সে প্রাক্আধুনিক বাংলা সমাজ জীবনের খলচরিত্র হিসাবে পরিচিত ঘোড়সওয়ার যুবক পরন্তপ ইন্দ্রাণীর চোখে সুপুরুষ ও সুন্দর তার ঘোড়াচালনার দক্ষতা দেখে ইন্দ্রাণী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রাণী তাকে পতিত্বে বরণ করেছিল দর্পনারায়ণের বিবাহ প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই। ধনৈশ্বর্যের আড়ম্বরে পরন্তপ সুরা ও নারীতে আসক্ত হয় চাঁপার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রক্তদহের দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের দিনে জোড়াদীঘির চিরাচরিত ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত হানে। এ ব্যাপারে তার রণকুশলতার পরিচয় পেয়ে ইন্দ্রাণীর

সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ক্ষণিকের জন্য গড়ে ওঠে। রক্তদহের সঙ্গে জোড়াদীঘির নারকেল কাড়াকাড়ি খেলার পর দুই জমিদারের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। লুঠতরাজ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খাজনালুঠ, বাজার লুঠ ছিল নিত্য দিনকার ঘটনা। রক্তদহের আক্রমণের সময় তার সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও তার পরাজয় ঘটলে দর্পনারায়ণ তাকে জোড়াদীঘির গুপ্তকারাগারে বন্দী করে রাখে। কারাগারে তার স্বগত ভাষণ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ।

বনমালা ইন্দ্রাণীর চিঠি পেয়ে পরন্তপ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রক্তদহে ইন্দ্রাণীর কাছে ফিরে এসে ইন্দ্রাণীকে জানায় তার অকুণ্ঠ প্রেম। কিন্তু ইন্দ্রাণীর উপেক্ষা তাকে বিমর্ষ করে তোলে।

'চলনবিল' উপন্যাসে পরন্তপ ইন্দ্রাণী কর্তৃক বিতারিত হয়ে চাঁপাকে নিয়ে পারকুল গ্রামে পরশুরামের ডাকাত দলের সর্দার হিসেবে পরিচিত হয়। কন্যা সুজানিকে হত্যা করার প্রয়াস মূলত চাঁপার প্রতি বিদ্বেষ মাত্র। ডাকাতি করতে গিয়ে দর্পনারায়ণের বন্দুকের নল থেকে সে রক্ষা পেয়ে ডাকুরায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ডাকুরায়ের পালিত কন্যা কুসমি তারই কন্য বালবিধবা সুজানি। কুসুমির প্রতি তার প্রলুব্ধ দৃষ্টি তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা ও চাঁপার অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। প্রমথনাথের কলমে পরন্তপ চরিত্রটি নারী মাংসলোলুপ, নীতিজ্ঞানহীনতার প্রতীক। চরিত্রটি রক্তমাংসে গড়া হলেও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের নবীননারায়ণ বিংশ শতাব্দীর জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি আমলাতন্ত্রের হাতের ক্রীড়নক ও কপট আইনজীবির দ্বারা পরিচালিত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নবীননারায়ণ প্রাচীন সংস্কারকে মেনে নেয়নি তার জমিদারীর বিপর্যয়ের জন্য শরিকি দ্বন্দ্বে অশ্বত্থ বৃক্ষটি কেটে ফেলার পরেই আকস্মিক ভূমিকম্পে জমিদারীর ধ্বংস সাধন ঘটে।

জমিদারী ধ্বংস হলে কলকাতায় ফিরেছে। তবে লেখক মুক্তামালার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

দীপ্তিনারায়ণ পুত্র কীর্তিনারায়ণের জমিদারী দম্ভ, তার প্রভূত্ব করবার মানসিকতা, শোষণ ও অর্জন লালসা শরিকি দ্বন্দ্ব নিয়তির নির্মম পরিহাসে অতীত গৌরব লুপ্ত হয়েছে। লেখক নবীননারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ চরিত্র সৃষ্টিতে অসঙ্গতি দেখান নি যুগচেতনার সঙ্গে অপূর্ব সঙ্গতি দেখিয়ে চরিত্রটিকে আধুনিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দর্পনারায়ণ পত্নী বনমালা চরিত্রটি প্রমথনাথের আন্তরিকতার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যস্রষ্টার রোমান্টিক দৃষ্টিতে লেখক এই চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণ কন্যা বনমালা রমাকান্তরায়ের কন্যা। পলাশীর অবক্ষয়িত জমিদারের প্রলুব্ধ দৃষ্টি চরিত্রটিতে কালিমা লেপন করে দিতে পারে নি। দর্পনারায়ণ পরন্তপের তাবু থেকে উদ্ধার করে বজরায় আশ্রয় দান করে। মেহগিনির পালঙ্কে বনমালার লাবণ্যকান্তিতে মুগ্ধ দর্পনারায়ণ বনমালাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। বনমালা আদর্শ পত্নী স্বামী দর্পনারায়ণের সুখে দুঃখে সমভাগিনী। উদয়নারায়ণের প্রত্যাখ্যানে বনমালা জানিয়েছেন - " আমাকে বিয়ে করাতেই কর্তার রাগ হয়েছে। "

পদ্মাবক্ষে নবদম্পতির প্রেমানুরাগের অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। পদ্মাবক্ষে বিপন্ন উদয়নারায়ণকে আপ্যায়ন করে জানতে পেরেছে সে উদয়নারায়ণের পৌত্রবধূ। উদয়নারায়ণ বনমালার নাম দিয়েছেন - " ভাগীরথীর শ্বেতপদ্ম "। সে সরলহৃদয়া ছদ্মবেশী বেঙাকে পারিতোষিক দিয়ে সন্তুষ্ট করেছে। রোমান্স নায়িকার মত পরন্তপকে গুপ্তকারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে এখানে অর নারী সুলভ সাহস ও সক্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। বনমালা জমিদারী বাজেয়াপ্ত হলে উদয়নারায়ণকে দুর্গাপূজার ব্যাপারে বঞ্চনা করেছে সবমিলিয়ে বনমালা চরিত্রটি অঙ্কনে লেখক সজীবতা দান করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বনমালা চরিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন -

'' বনমালা প্রত্যূষলগ্নের ' ঊষার উদয় সম ' নির্মল, মানবজীবনের জটিলতামুক্ত, উদার আবির্ভাবের উপর কোন বর্ণানুরঞ্জন ঘটায় নি, আবির্ভাব মুহূর্তে যে ঊষা, মৃত্যুর পরে সে স্মৃতির আকাশে শান্ত সমুজ্জ্বল তারা।'' [১৫]

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের ইন্দ্রাণী রক্তদহের জমিদার কন্যা, পিতৃহীনা, রক্তদহের জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, পরন্তপ পত্নী। ইন্দ্রাণী চরিত্রটির মধ্যে লেখক পৌরাণিক নারীর আদর্শমূর্তি অঙ্কন করেছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রার মত মহৎ দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়েছে ইন্দ্রাণী।

বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ ইন্দ্রাণীর রূপ ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে পৌত্র দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ স্থির করে ইন্দ্রাণীর নাম রেখেছেন 'রক্তদহের রক্তকমল'। দর্পনারায়ণ শিকার ছলে ইন্দ্রাণীর চন্দ্রকান্তা স্নিগ্ধরূপ দেখে ভেবেছিল - '' বিনা পরিশ্রমে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।'' ঘটনাক্রমে দর্পনারায়ণ বিপন্ন বনমালাকে বিয়ে করার দুঃসংবাদ পেয়ে ইন্দ্রাণী মানসিক আঘাতে বিধ্বস্ত হলেও তার সৌন্দর্য এতটুকুও হ্রাস পায় নি। প্রমথনাথ অল্প বর্ণনায় পৌরাণিক পাষাণ সুন্দরীর মত একটি চরিত্রের গোটা ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে লাবণ্যময় ভাষায় তুলে ধরেছেন ঃ

''ইন্দ্রাণীর মত সুন্দরী কচ্চিৎ দেখা যায় তার সুঠাম উন্নত সরল দেহ বাঙালী মেয়ের তুলনায় দীর্ঘ; . . . ইন্দ্রাণীর চন্দ্রকান্ত ললাটের নিম্নে ভ্রুরেখা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে কোথায় যে শেষ হইয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা যায় না; সেই ভ্রুর নিচে চোখ দুটি ভাসমান পদ্মের মত বিগলিত মাধুর্যপূর্ণ নয়, স্থির মহিমায় অচঞ্চল; গোলাপের দলের মত পাতলা অধরোষ্ঠ, যেন অনায়াস দৃঢ়তায় অন্তরের রহস্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে। শুক্তিপাণ্ডু দুই কপোলে লাবণ্যের পুষ্পমঞ্জরী রজনীগন্ধার বৃন্তকে লাঞ্ছিত করা সরল গ্রীবাতটে তিনটি মাত্র রেখা; মর্মর ধবল নিটোল বাহু যুগলের শেষপ্রান্তে তপ্ত রক্ত দুইখানি করপদ্ম পাঁচটি করিয়া ক্রমসূক্ষ্মায়মান

কোমল সুগোল অঙ্গুলিতে পর্যবসিত। যখন সে চুল খুলিয়া দেয়, সেই সুদীর্ঘ সরল সুপ্রচুর চিক্কণ কেশরাশিতে কশাহত আলো চঞ্চল হইয়া ওঠে।... ইন্দ্রাণী দূরগগনের নক্ষত্রের মত নিজের আলোর আড়ালে নিজে অবগুণ্ঠিত। যে খুব বেশি তাকে দেখিতে পায়, সেও তাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না।"

দর্পনারায়ণের বিবাহ সংবাদ তার আত্মবিশ্বাস ও অহংকারে আঘাত হেনেছিল বলেই চিরকুমারী থাকবার বাসনা তার মনে জেগেছিল। আবার দর্পনারায়ণের প্রতি প্রতিহিংসায় প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য দর্পনারায়ণের শত্রু পরন্তপকে বিবাহ করে। পরন্তপের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। পরন্তপের সুরা ও নারীতে আসক্তি তার মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে অপরদিকে প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নারকেল কাড়াকাড়ি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জোড়াদীঘিগ্রাম ও রক্তদহ গ্রামের সঙ্গে। গণযুদ্ধে রক্তদহের পরাজয়ে তার চিত্ত বিস্ফোরণ আরও উগ্রতর করে তোলে।

দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে পরন্তপের সক্রিয়তা তাদের মধ্যে আপাত সুসম্পর্ক গড়ে উঠলেও দুই গ্রামের দ্বন্দ্বে পরন্তপের বন্দিত্ব তার মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবুও তার সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় বনমালাকে পত্র লেখার মধ্য দিয়ে। কারামুক্ত পরন্তপকে সে জানায় তার চিঠির লিখবার কারণ -

" চিঠি লিখিয়াছি কেন? তবে শোন - এই সর্বনাশের খেলায় তোমাকে আমিই নামিয়েছিলাম, তোমার বিপদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, সেইজন্য কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।"

কিছুদিন আগে পরন্তপের প্রতি বীরপূজা ও স্বল্প সময় পরেই তার নির্লিপ্ত মানসিকতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

চলনবিল পর্বে ইন্দ্রাণী পরন্তপ ও চাঁপার অবৈধ প্রণয়কে কেন্দ্র করে চিরদিনের মত

দেউড়ি বন্ধ করে দেয়। সামগ্রিক বিচারে ইন্দ্রাণী চরিত্রটি রক্তমাংসে গড়া চরিত্র হতে পারে নি।

প্রমথনাথ সৃষ্ট সেনাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত জেনারেল, রেসেলাদার, কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার, হিসাবনবিস চরিত্রগুলো রক্তমাংসে গড়া চরিত্র হয়ে উঠেছে। বাঙালী যুবক জীবনলাল বাদশাহী সেনাবিভাগে যোগদান না করে ইংরেজ কোম্পানীর রেসেলদার পদে নিযুক্ত। কর্নেল হুইটম্যানের কামানের মুখ থেকে ঘটনাক্রমে বেঁচে গিয়ে সে কোম্পানীর বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছে। জীবনলালের জবানীতে লেখক বর্ণনা করেছেন দেশীয় সৈন্যদের চেয়ে ইংরেজ সৈন্য অনেক বেশী সক্রিয়। জীবনলালের প্রিয় Wolfboy মানুষবাঘ যার নাম ক্যালিবান। পান্নার সঙ্গে তার প্রথম সম্পর্ক গড়ে উঠলেও রুমালীর ও তুলসীর প্রেমের আবর্তে সে ঘূর্ণায়মান। তবে পিতৃপ্রদত্ত তক্তির লেখা থেকে জানতে পারে খুনী সুখানন্দের পরিবারের সঙ্গে তার আত্মীয়তা নিষিদ্ধ। লেখক জীবনলালের সঙ্গে তুলসী ও রুমালীর প্রেমের বৈপরীত্য চিত্র দেখিয়েছেন। বাদশার সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধে জীবনলালকে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণে তার রণকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে শাহজাদার প্রতি দুর্বলতা দেখাবার অভিযোগে জীবনলালের মৃত্যু ঘটে। লেখক জীবনলালের প্রেমমূলক কাহিনী অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্বরূপরামের ব্যর্থ প্রেম, লালকেল্লা আক্রমণের দুঃসাহসিকতা খুরশিদ জানের সঙ্গে তার সম্পর্ক চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কর্ণেল ব্রিজম্যান কোম্পানীর যোগ্য ব্যক্তিত্ব। লালচে রং এর দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিত ব্রিজম্যান ইংরেজ কোম্পানীর সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। রুমালীর প্রতি তার উক্তি -

" তুমি যদি গোয়েন্দা না হও, তবে গায়ের দিকে দুধ বেচতে গেলেই পার, ফৌজীর জমিতে আস কেন?" লেখকের কলমে ব্রিজম্যান চরিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে।

হডসনের সপ্রতিভতা, নিকলসনের নেতৃত্ব, নয়নচাঁদের দেশাত্ববোধ, গুরুবচনের কোম্পানীর প্রতি একনিষ্ঠতা 'লালকেল্লা' উপন্যাসের অন্যতম সামরিক চরিত্র। সামরিক চরিত্র অঙ্কনে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমথনাথের শিক্ষক চরিত্রগুলি ভট্টাচার্য পন্ডিত, বানীবিজয়, আবিনাশ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের ভট্টাচার্য পন্ডিত ও বানীবিজয় চরিত্রের উপস্থাপনায় উনবিংশ শতকের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দেখিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে টোলের শিক্ষাব্যবস্থার বৈপরীত্য রয়েছে। টোলের শিক্ষক ও গৃহশিক্ষকরা তাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয় নি। তৎকালীন যুগপ্রভাবের সঙ্গে এই চরিত্রগুলো সঙ্গতিপূর্ণ। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠাতারূপে অবিনাশ একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি। জাতীয় চেতনা স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত অবিনাশ বহু ছাত্রকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে এজন্য সে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। কেননা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত নয়। স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে তাকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বহু অত্যাচার সহ্য করেও দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য তার সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। অবিনাশের মেয়ের বিয়ের জন্য ছাত্রদের সংগৃহীত চাঁদা ও নবীন মুদির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। টোলের পন্ডিত ও পাঠশালার শরৎপন্ডিত একেবারে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ হয়ে উঠেছে।

লেখকের অধ্যাপক চরিত্রগুলো আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সারদা ভট্টাচার্য টোলের অধ্যাপক। অশ্বত্থের অভিশাপ এর এই চরিত্রটি তৎকালীন প্রাচীনধারার শিক্ষাব্যবস্থার যোগ্য প্রতিনিধি। এছাড়া 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের উইলিয়াম কেরী ও রামরাম মালদহের মদনাবাটিতে বিদ্যালয় স্থাপন করেছে রেশমী সেখান থেকে শিক্ষালাভ করেছে। রেশমী ছিল

সেই বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী। পরবর্তীতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষরূপে তার সক্রিয় ভুমিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, কুসংস্কার দূরীকরণের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসাতীত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

" ধর্মযাজক কেরী তাহার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মধ্যে বাঙালীর অন্তরলোকের পরিচয় পাইয়া ও তাহার মুখে নতুন ভাষা আরোপ করিয়া জীবনবোধের এক নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

রামরামের পঞ্চগোড়াকে কেন্দ্র করে লেখা শ্লোকটি তাৎপর্যপূর্ণ -

"হেয়ার কল্বিন পামরশ্চ,
কেরী মার্শমেনস্তথা
পঞ্চগোরা স্মরেন্নিতং
মহাপাতক নাশনং।"[১৬]

প্রাতঃ স্মরণে উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে কেরীর বন্দনার তুলনাটিতে লেখক শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

'কেরী সাহেবের মুন্সী'র রামরাম বসু চরিত্রটি প্রমথনাথের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। রামরাম বাঙালী বাংলা গদ্যের পদাঙ্কে তার দান অপরিসীম। কেরীর খ্রীষ্টগীত রচনা করলেও সনাতন ধর্মবিশ্বাসকে সে আকারে ধরে ছিল। কেরীর অনুরোধে ক্রীতদাস ন্যাড়াকে তার গৃহে আশ্রয় দেয়। স্ত্রীর সঙ্গে তার বিরোধের কারণ তার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ, সাহেব পাদ্রীর সঙ্গে উৎসুক্য। রামবসু প্রসঙ্গে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন--

" রামবসু নতুন জগতের মানুষ, স্থান ভ্রষ্ট হয়ে বাংলাদেশে আবির্ভূত। রামবসুর বিশ্বাস জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, সব সমস্যার সমাধানে সক্ষম তার জাহাজের নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান; নীতি, ধর্ম,

বিবেকের পুরাতন কাঁটা কম্পাস অতলে নিক্ষিপ্ত ধ্রুবতারার উপরে নেই তার আস্থা।"

অখন্ড জ্ঞানের তৃষ্ণা রামরামের - হোলি বাইবেল সামনে রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে সে টম জোনস, ফিলডিং পড়ে। নব্যযুগের অদম্য জিজ্ঞাসা তার মনে। চন্ডীবক্সীকে শাসিয়ে জানিয়েছে - "ওর নাম কেরী সাহেব, বিলেত থেকে সবে আমদানি হয়েছে - কলকাতার চুনোগলির ফিরিঙ্গি নয়।"

লেখক রামরামকে ধূর্ত , ঘোড়েল প্রা জ্ঞ বাস্তববাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন। গৃহে অন্নদার সঙ্গে নিত্য কলহ সংসারের সুখ শান্তি না পেয়ে রক্ষিতার বাড়িতে রাত কাটায়। মালদহের মদনাবাটিতে নির্জন সন্ধ্যায় অনাবৃত, আত্মবিস্মৃত অবস্থায় পূর্ণিমাচাঁদের মত রেশমীকে দেখে তার মনে সৌন্দর্যতৃষ্ণা জাগে রেশমীর ঘরে নৈশ বিহার করতে তার বাধে না। সে মডার্ন ম্যান।

জনের সঙ্গে রেশমীর বিবাহের ব্যাপারে রেশমীকে জানায় সে নেটিভ হয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে জনকে বিয়ে করলে কোন কুলেই তার মর্যাদা থাকবে না। স্ত্রীর জন্য সেমিজ কিনে আনলে অন্নদা তা প্রত্যাখ্যান করে। স্ত্রীকে মডার্ন করতে চেয়েও সে নিজে সনাতন ধর্মকে উপেক্ষা করতে আগ্রহী। তবে তা ভক্তিতে নয় জ্ঞান আর হৃদয়ের মিলিত ভাবে লেখক জানিয়েছেন -

'রামবসু জাতশিল্পী।'

আধুনিক মানুষ রামরাম আবার জনকে প্রাচীন কুসংস্কারকে আকরে ধরে রাখতে জনকে নিয়ে যায় রূপচাঁদ পক্ষীর কাছে। ভারতীয় বশীকরণ মন্ত্র আর তাগা তাবিজের ব্যবস্থা করে দিল জনকে। রেশমী জনের প্রেমের টানাপোড়েনে রামরাম রেশমীর চিঠির প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন জনকে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করে তার মনে বারবার প্রশ্ন জেগেছে সতীদাহ প্রথাকে বন্ধ করবেন কিভাবে। রামমোহনের কাছে গিয়েছেন একাধিকবার, তিনি তাকে আশ্বাস দিলেও রামরাম দ্রুত এর প্রতিকার চেয়েছে। রেশমীর আত্মাহুতি তার মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে তার কর্মশক্তি, বাক্‌পটুতা ও বুদ্ধি নিস্তেজ হয়ে যায় সে কলেজে নিয়মিত আসে না। একদিন অসুস্থ অবস্থায় সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারের সহমরণের দৃশ্য তাকে আরও বিব্রত করে তোলে সে রক্ষা করতে পারেনি মেয়েটিকে। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকলে সে সেদিন স্বগৃহে রাতে পূর্ণজ্ঞান ফিরে পাবার পর রেশমী, রেশমী, রেশমী বলে অন্তিম উচ্চারণ করে নিভে গেল তার জীবনদীপ।

প্রমথনাথের রামরামবসু চরিত্রটি কোথাও অসঙ্গতির সৃষ্টি করেনি। লেখকের চরিত্রসৃষ্টি কতটা শিল্পসমৃদ্ধ তার নিদর্শন রামরাম বসু।

প্রমথনাথের অধ্যাপক চরিত্র উইলিয়াম কেরী অনবদ্য সৃষ্টি। উইলিয়াম কেরীর উদার মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ কেরী সপরিবারে বিলেত থেকে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে টমাসের পরামর্শে এসেছিলেন। একচল্লিশটি বসন্ত কলকাতায় কর্মসূত্রে কাটাতে হবে ভেবে কলকাতার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটল রামরাম ও টমাসের সঙ্গে কলকাতা ভ্রমণে।

খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তার অখন্ড বিশ্বাস তার ধারণা একদিন পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব কলহ যুদ্ধ বিগ্রহ থাকবে না খ্রীষ্টীয় ধর্মের ব্যাপকতায় অস্ত্রাগারের উপর গড়ে উঠেবে গীর্জা। মানবতাবাদী কেরী ক্রীতদাসের নির্মমতা সহ্য করতে পারে নি সে কুড়ি টাকায় ন্যাড়াকে কিনেছিল এবং তাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিল।

বাংলা ও ফরাসী ভাষার প্রতি আগ্রহ বশত রামরামের কাছে এই ভাষা শিখেছে ধর্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে কলকাতার সঙ্গে মালদহকেও বেছে নিয়েছে। কেরীর ধারণা ধর্ম যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সক্ষম ।

কেরীর সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় জ্বলন্ত চিতা থেকে রেশমী উদ্ধারের সময়। চন্ডীবক্সীর প্রবল গর্জনের মুখে রেশমীকে যে আশ্বাস দিয়ে বলেছে -

" তুমি ডরো মৎ, ঐ মিন্সের হাতে তোমাকে আমি ছাড়বনা। "

বন্দুক নিয়ে নির্ভীক কেরী বলেছেন -

" মিন্সেরা, এখন সর্তক হও, আমি ধর্মযাজক কেরী, কিন্তু প্রয়োজন হলে বন্দুক ধারণ করতে সর্মথ। "

রেশমীকে উদ্ধার করে সে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছে। মদনাবাটিতে বিদ্যালয় স্থাপন করলেও শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, দুই পুত্রের মৃত্যু , স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি তাকে আদর্শচ্যুত করেনি। সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ ও বাইবেলের তর্জমার কাজ চলতে থাকে দ্রুতগতিতে।

লেখক 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে সুরেন্দ্রনাথকে , 'পদ্মা' উপন্যাসে অবিনাশ উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক চরিত্র। স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ তার অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গেও রাজনৈতিক সক্রিয়তা তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক রণকুশলতা আমাদের মুগ্ধ করে। 'পদ্মা' উপন্যাসে অবিনাশবাবু বিনয়ের অধ্যাপক। গৃহে ছাত্রদের নিয়ে আড্ডা। তার মেয়ের প্রতি গভীর স্নেহ স্ত্রীর সঙ্গে তার কলহ কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের প্রতিফলন।

শচীনের স্বদেশপ্রেম, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অগাধ পান্ডিত্য, কেরীর বঙ্গভাষা ব্যবহারের উপদেশ, তার কঠোর শাসন তৎকালীন যুগের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক চরিত্র প্রমথনাথের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রমানাথ বাচস্পতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক। শিক্ষকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত। বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও তিনি তার ব্যক্তিত্বকে বিকিয়ে দেন-নি।

প্রমথনাথ বিশী বিভিন্ন যুগের অধ্যাপক চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সজীবতা দান করেছেন সন্দেহ নেই।

লেখকের ব্যবসায়ী চরিত্রগুলো বেশিরভাগ সৎগুণে গুণান্বিত। ভজহরি দাসের মত সুস্থ ধর্মপরায়ণ ব্যবসায়ী আমাদের চোখে পড়ে না। নবীন মুদির মহত্ত্বতা, অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়েতে তার অসামান্য দান ব্যবসায়ী চরিত্রকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের ব্যবসায়ী চরিত্রের চেয়ে প্রমথনাথ সৃষ্ট ব্যবসায়ী চরিত্র আদর্শস্থানীয়।

প্রমথনাথ ইতিহাস খ্যাত কিছু চরিত্রকে উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনে এনেছেন আবার কেউ নেপথ্যে থেকে ঘটনাপ্রবাহের পরিচালকরূপে অবস্থান করেছে। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের উপস্থিতি ঘটেছে সীমিত কালের জন্য জন। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বিশাল রণবাহিনী নিয়ে মোতিরায়ের বাগান বাড়ি আক্রমণ করতে যাবার সময় দ্বারিকাবাবু ও রামমোহন সুদৃশ্য ব্রুহাম গাড়িতে উপবিষ্ট এই সময় উভয়ের সংলাপটি উদ্ধৃতি করছি - দ্বারিকাবাবু - দেওয়ানজী, সাহেবগুলোর স্পর্ধা বেড়ে উঠেছে? রামমোহন তখন সুদূরপ্রসারী মন নিয়ে বলেছেন বঙ্গদেশে একদিন নবজাগরণ ঘটবেই।

রাধাকান্তদেব শোভা বাজার রাজবংশভূত সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষক। হিন্দু সমাজপতি হিসেবে তার খ্যাতি কলকাতাব্যাপী। কলকাতার কাশীপুরে তখন বাবু মোতিরায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠেছে তার বাগান বাড়িতে রক্ষিতাদের বিলাসস্থল। মোতিরায়ের জ্ঞাতি মাধবরায় রাধাকান্তদেবকে মোতিরায়ের বিপক্ষে নালিশ জানালে লাট কাউন্সিলের সেক্রেটারি ম্যাকার্থিকে চিঠি লিখে। ম্যাকার্থি স্পোকারকে চিঠি লিখলে পুলিশ বাহিনী কাশীপুরের অভিমুখে যাত্রা

করে। স্বল্প কালের উপস্থিতি হলেও রাধাকান্তদেব চরিত্রের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

রংপুরের কালেক্টর ডিগবি সাহেবের একান্ত প্রিয় দেওয়ান রামমোহনের সঙ্গে রামরামবসুর সহমরণ বিষয়ে আলোচনাকালে লেখক রামমোহনের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন " রামমোহন খালি পায়ে খাটো তেলধুতি পরা অবস্থায় বিপুল পালোয়ানী আয়তন অনেকটা রঘুবংশ পড়া দিলীপের চেহারার মতো। বেহারা সশব্দে তার উদার বক্ষে, প্রশস্ত পৃষ্ঠে, যুগন্ধর স্কন্ধে সশব্দে তেল মাখছে। মুখমন্ডল অনুসারে তার চোখ দুটি ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা যুক্ত। সরল নাসিকাটির মাঝখানে একটুখানি অতর্কিত উচ্চতা।" সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে বলেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সহমৃতা হবার ঘটনা তার কাছে মর্মভেদী। একদিকে পাদ্রীর দল অন্যদিকে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের 'দোহাত্তা লড়াই' এর আর দেরী নেই।

রামমোহন কেরীর গুণগ্রাহী তার মূল্যবান মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ

" বিধাতা কাকে দিয়ে কোথায় যে কি কাজ করিয়ে নেয়, মানুষের সাধ্য কি রোখে? বিধাতা এক হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন ক্লাইভকে আর এক হাতে পাঠিয়ে দিলেন কেরীকে, একহাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন হেস্টিংসকে , আর একহাতে পাঠিয়ে দিলেন হেয়ারকে, দুই হাত লাগিয়েছেন তিনি এদেশকে জাগাবার কাজে। ক্লাইভ, হেস্টিংস এদেশকে বাঁধছে শাসনের জালে, আর কেরী, হেয়ার এ দেশকে মুক্তি দিচ্ছে আত্মার অধিকারে। বন্ধনে আর মুক্তিতে কেমন সহযোগিতা করে চলেছে লক্ষ্য করেছ কি? "

রামমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশের যাবতীয় কুসংস্কার সহমরণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম দূর হবে। প্রমথনাথ বিশী রামমোহনের চিন্তাধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

এছাড়া 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ,

অরবিন্দ ও নিবেদিতা চরিত্রের স্বল্পকালের উপস্থিতিতে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। উক্ত চরিত্র অঙ্কনে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক বাস্তবসচেতন শিল্পী। 'পদ্মা' উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত চরচিলমারী গ্রামের মুসলমান চাষীর এক প্রতিনিধি হল করিম চরিত্র। করিম ভাগচাষী। তারণদাসের জমি চাষ করে চৈতালী ফসলের ভাগ পৌঁছে দেয়। পদ্মার ভাঙনে জমির একাংশ বিনষ্ট হয়ে যাবার খবর সে প্রদান করে কঙ্কণকে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন -

" করিমের বয়স চব্বিশ পঁচিশ। ছিপছিপে গড়ন - রংটা আধফর্সা। কঙ্কণের পাড়াতেই বাড়ি।" সহজ সরল বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে লেখক করিমকে উপস্থাপিত করেছেন। চরিত্রের উপযোগী ভাষাও দিয়েছেন লেখক। রাজসাহীর আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে লেখক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্যচাষীটি যখন কঙ্কণের নামে অপবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে তখন চরিত্রটি তার স্বাভাবিকতা হারায়নি। লেখক গ্রাম্য চাষীদের চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরেছেন যথাযথভাবে।

ডাকমুন্সী 'পদ্মা' উপন্যাসের পোষ্টমাস্টার চরিত্র। তাকে মুসলমান পল্লীর সরল অধিবাসীরা ভালবেসে ডাকমুন্সী বলেই ডাকে তার প্রকৃত নাম তারণদাস। কৃষিকাজের সঙ্গে সে যুক্ত। সরলহৃদয় ডাকমুন্সী পোষ্ট অফিসের টাকা অল্পদিনের জন্য বিপন্ন মানুষদের দিত। হিসাবের অমিলের জন্য ইন্সপেক্টর তাকে 'সাস্পেন্ড' করলে সে গোবিন্দপুর ছেড়ে চরচিলমারী আশ্রয় নেয়। কঙ্কণের প্রতি তার অপত্য স্নেহের অভাব নেই কিন্তু মেয়ের অসামাজিক মাতৃত্বের সম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে আত্মঘাতী হয়ে মারা যায়। প্রমথনাথ বিশী বাস্তব সচেতনভাবেই পোষ্টমাস্টার চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। পল্লী বাংলার সহজ সরল চরিত্র তারণদাসের আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের ইতিহাস সম্ভাবনাজাত কলকাতার বাবু সমাজের

প্রতিনিধি মোতিরায়। মোতিরায় চরিত্রটিতে তৎকালীন বাবু সমাজের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লেখকের এই চরিত্রটির অবতারণা। ধন ঐশ্বর্যে স্ফীত মোতি কলকাতার বাবু সমাজের অন্যতম। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে সুরা ও নারীতে আসক্ত থাকে সে। চন্ডীবক্সীর সঙ্গে তার দীর্ঘকালের পরিচয়। তার মুখে রেশমীর ঘটনা শুনে রেশমী উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়। সামাজিক মর্যাদার জন্যই রেশমীকে উদ্ধারে ব্যস্ত। সুকৌশলে কেরী রামরামকে আসামী সাজিয়ে মামলা সাজাতে তার বাধে নি। সে শুধু ধনবান নয় বুদ্ধিমান ও কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে। হিন্দু সমাজের প্রধান হয়ে খ্রীষ্টানরা হিন্দুনারীকে আশ্রয় দিয়েছে এটা তার কাছে অসহ্য ব্যাপার। সেকালে কামিনী কাঞ্চনেই কৌলীন্য বিচার হত। রেশমীর আগমন উপলক্ষ্যে বাগান বাড়িতে নাচগান, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগমন, বাজি পোড়ানো নাচমহলে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে। রেশমীকে সনাক্ত করতে না পেরে চন্ডীকে ভয় দেখায়।

রেশমীকে পাবার পর সে সর্তক করে দেয় " পালাতে চেষ্টা করলে ডালকুত্তায় ছিড়ে ফেলবে, সে চেষ্টা কর না।" রেশমীর আত্মাহুতির দিনে জনতা তাকে নাস্তানাবুদ করেছে। লেখক এভাবে বাবু সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন মোতিরায়ের চরিত্র অঙ্কন করে।

'চলনবিল' উপন্যাসের ডাকুরায় চরিত্রটি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। ডাকাত সর্দার হলেও উপন্যাসে কোথাও তাকে সমাজবিরোধীমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায় নি। সে ধুলোউড়ির কুঠি গ্রামের প্রধান গ্রামীণ জীবনের সর্বেসর্বা হিসেবে তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে। নবাগত দর্পনারায়ণের সঙ্গে তার প্রতিন্দ্বন্দ্বিতার কারণ হল মর্যাদা নিয়ে আবার পরন্তপের সঙ্গে তার নির্যাতনমূলক মিতালি গড়ে উঠেছে। মাতা ক্ষেন্তবুড়ির সঙ্গে তার মাতা পুত্রের সম্পর্কের কোথাও ত্রুটি নেই আবার পালিত কন্যা কুসমির বিবাহের জন্য তার সক্রিয়তা একটা পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক জীবনের চিত্র। কর্তব্যপরায়ণ ডাকু রায় আহত পরন্তপকে তার নিজের

ঘোড়ায় তুলে পৌঁছে দেয় পারকুলে। কুসমির বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে সে পিতার দায়িত্ব পালন করেছে। মোহনকে মুক্তি দিয়ে পরন্তপের উদগ্র কামনার হাত থেকে সে বাঁচিয়েছে। ডাকুরায় চরিত্রটি লেখকের কলমে সজীবতা দান করেছে।

পরশুরামদলের দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দার পরন্তপ চরিত্রটিতে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন লেখক। ইন্দ্রাণী কর্তৃক বিতাড়িত পরন্তপ চাঁপাকে নিয়ে সংসার জীবন গড়ে তুললেও তাদের সংসারজীবন সুখের হয়নি। লেখক ডাকুরায় ও পরন্তপ পরস্পর বিরোধী দুই চরিত্রের সৃষ্টি করে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের কালেক্টর মিঃ বার্ড চরিত্রটি লেখকের কলমে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। দর্পনারায়ণের সঙ্গে পরন্তপের লড়াই ও পরন্তপকে গুপ্ত কারাগারে রাখার অভিযোগে দর্পনারায়ণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তার সাত বছরের জেলের ঘটনার পেছনে মিঃ বার্ড এর ভুমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। চরিত্রটির সংলাপ ও তার ষড়যন্ত্রকুশলতায় রক্তমাংসে গড়া চরিত্র হয়ে উঠেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট ক্লোজেট ও ডোভার চরিত্রদ্বয় লেখকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ডোভার সাহেব ও মিঃ ক্যালেন সাহেব অনেকটা নরমপন্থী। ক্লোজেট ও ডোভার স্বদেশী বিদ্যালয় বাতিল করতে গিয়ে তাদের ব্যর্থতা ও অপমানের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে। ক্লোজেট সাহেব স্বদেশী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 'ব্যান্ড ম্যাটরর্ম্' বলে প্রসেসন করলে সে উত্তেজিত হয়ে জানায় - শহরের লোক সবাই বড্মাশ হারামজাডা তারা তলে তলে সবাই স্বদেশী। অবিনাশের সঙ্গে ক্লোজেটের সাক্ষাৎকার মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। আবার ক্লোজেট বীরেন চৌধুরী, যদু মৈত্রকে স্পেশাল কনস্টেবল সাজিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখাবার ঘটনা হাস্যরসাত্মক হয়ে উঠেছে।

লেখক পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ মজুমদার ও মিস ফ্লোরা চরিত্রদ্বয় সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর নির্মম অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। জেলখানায় তাদের নির্মম অত্যাচারে স্বদেশীরা মারা গেলে প্রচার করা হতো অ্যাপোপ্লেক্সি রোগে তাদের মৃত্যু হয়েছে এরূপ বাস্তব চিত্র লেখক আমাদের শুনিয়েছেন এবং চরিত্রদ্বয়ের স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশ যখন উত্তাল সুরেন বাড়ুজ্জে, রাসবিহারী ঘোষ, বিপিন পাল প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতাদের বাংলা বক্তৃতা যতটা সাধারণ স্তরের জনমানসে প্রভাব ফেলতে পারে নি তার চেয়ে হিন্দী বাংলা মিশ্রিত টহলরাম গঙ্গারামের বক্তৃতা ছিল অনেকের বোধগম্য।

কথাশিল্পী বুদ্ধিজীবি উকিল শ্রেণীভূক্ত তারিণী, তারাচরণ, সারদা, হরিপদ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তারিণী জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার উপন্যাসের উকিল যুক্তির মারপ্যাঁচে তখনকার বিবাদের মীমাংসা করত। বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসের তারাচরণ, সারদা, হরিপদ উকিল হলেও উকিল হিসেবে তাদের নামডাক নেই। স্বাধীন বৃত্তি হিসেবে বুদ্ধিজীবি ওকালতিকে অনেকেই বেছে নিলেও তাদের আয়ের পথ সুপ্রশস্ত ছিল না। রাজসাহীতে অলবেঙ্গল লোন অফিসে তাদের আড্ডার আসরে রাজনৈতিক সমালোচনা ও স্বদেশীদের কোনঠাসা করার ফন্দি আবিষ্কার করত। অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে হরিপদর ঘৃণ্য ভূমিকা উকিলদের পক্ষে বেমানান হলেও ঔপন্যাসিক বাস্তব সচেতনভাবে উকিলচরিত্র অঙ্কন করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুলিশরা ছিল ইংরেজদের সমর্থন পুষ্ট। স্বদেশীদের প্রতি তাদের নিষ্ঠুর আচরণ ছিল সেসময়কার দৈনন্দিন ঘটনা। জেলখানায় সুশীলের মৃত্যুর পর পুলিশ শচীনকে জানিয়েছে -

"শচীন, পুলিসের মতো বিশেষজ্ঞ হলে বুঝতে পারত অ্যাপোপ্লেক্সি রোগে মৃত্যু হঠাৎ

ছাড়া হয় না।'' অবিনাশ বুঝতে পেরেছে সুশীলের গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর কারণ পুলিসের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। আবার 'দেশের শত্রু' উপন্যাসে সত্যাগ্রাহীদের কারাবরণকালে গদাধরবাবু কয়েকজনকে কিছু মুদ্রা দিয়েছিল যাতে পুলিশরা অর্থ পেয়ে তাদের শীঘ্রই মুক্তি দেয়। অত্যাচার ও ঘুষনেয়া এগুলো ছিল পুলিশদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

রাজনৈতিক কর্মীরূপে শচীন, সুশীল, রমণী, ভূপতি, অরবিন্দ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। শচীন পিতার ইংরেজ তোষণনীতির প্রতিবাদ স্বরূপ নিজ প্রচেষ্টায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছ, সে নিয়মতান্ত্রিক দলের নেতা, সুশীল চরমপন্থী দলনেতা সশস্ত্র আন্দোলনেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হবে এই বিশ্বাস সে পোষণ করেছে। ভূপতি সসৈন্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত, রাধা চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলভূক্ত, লব গান্ধীবাদী ও কুশ কম্যুনিষ্ট দলভূক্ত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। লেখক রাজনৈতিক কার্যপরিচালনার সঙ্গে স্বদেশের জন্য মহৎ আত্মত্যাগ দুঃখবরণে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের ভৃত্য চরিত্রগুলো সজীব হয়ে উঠেছে। মিতনের প্রভুভক্তি বিমলকে দাদাবাবু বলে সম্বোধন, দাদাবাবুর জন্য তার সক্রিয়তায় ও বিমলের মৃত্যুর পর তার জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দর্পনারায়ণের ভৃত্য মুকুন্দ বিশ্বাসী - ধুলোউড়ির কুঠিবাড়িতে দীপ্তিনারায়ণকে স্নেহে আন্তরিকতায় পূর্ণ করে রেখেছে। মুকুন্দ চরিত্রটি লেখকের অনবদ্যসৃষ্টি।

ক্রীতদাস ন্যাড়াকে মাত্র কুড়ি টাকায় খাঁচার বন্দী অবস্থা থেকে কেরী সাহেব কিনে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। তার আন্তরিকতা কেরী ও কেরী পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের অপত্য ভালোবাসা চরিত্রটিকে মহত্ত্বতা দান করেছে। লেখকের ন্যাড়া চরিত্রটি সফল সৃষ্টি।

প্রমথনাথের চন্ডীবক্সী, তিনু চক্রবর্ত্তী ও মানিক চক্রবর্ত্তী এই তিন পুরোহিত চরিত্র উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে মানিক চক্রবর্ত্তী ও শশাঙ্ক আধুনিক মর্যাদা রক্ষার জন্য যজমানী ব্যবসার সঙ্গে সুদের কারবার যুক্ত করে। তিনু চক্রবর্ত্তী চরিত্রটি প্রমথনাথের অপূর্ব সৃষ্টি। চন্ডীবক্সীর মত সমান কৃশ, সমান দীর্ঘ ও হাঁপানি রোগী হলেও চন্ডীর কপটতাকে সে পছন্দ করেনি। তিনুর জেলেনী অপবাদকে নিয়ে বারোয়ারীতলার বিচার সভায় চন্ডীর সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ও তাদের সংলাপে দুই চরিত্রের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন লেখক। রেশমীর চিতা থেকে পালানো ও কেরীর আশ্রয়ে থাকবার অভিযোগে তিনু চন্ডীকে জানায় -

" যদি কোন শাস্ত্রে অনাথা বালিকাকে পুড়িয়ে মারার বিধান থাকে, তবে সেই শাস্ত্র ভরে আমি ইয়ে করি।" সে কেষ্ট কবিরাজের কাছে চন্ডীর যাবার কারণ সভাস্থলে ফাস করে দিয়েছে। বিষয় সম্পত্তি, স্ত্রী পুত্র, কড়ি,ঘর, স্বাস্থ্য, বিদ্যা কোনটিই তার নেই আছে শুধু অদম্য সাহস ও অপ্রিয় সত্য ভাষণ। মোক্ষদাকে একঘরে করে রাখবার ব্যাপারে তার আপত্তি। তিনু একদিন কেরী ও রামবসুকে জানায় চন্ডীর আসল উদ্দেশ্য, সতর্ক করে দেয় রেশমীকে চন্ডীর হাজার চোখ কলকাতার যে কোন জায়গা থেকে রেশমীকে সে ধরে এনে পুড়িয়ে মারতে পারে। তিনু নাস্তিক নয় তবে সে সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী।

জোড়ামউ গ্রামের চন্ডীখুড়ো বাস্তব চরিত্র। বঙ্গসমাজে চন্ডীখুড়োর মত চরিত্রের অভাব নেই। বিষয় সম্পত্তির লোভে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে খোল কাঁসর বাজিয়ে নৃশংসভাবে সহমরণের ব্যবস্থা করেছে সে। সম্পত্তির লোভে মুমূর্ষু রোগী অম্বিকার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিবাহ বেশেই রেশমীকে সহমরণে যেতে চন্ডীর ভূমিকাই বেশি। রেশমী কেরীকে জানিয়েছে " চন্ডীখুড়ো সব নষ্টের গোড়া। রেশমীকে সে বলেছে রামরামকে ভয় দেখিয়ে সে তার আত্মপরিচয় দিয়েছে -

" আমাকে চেননা মনে হচ্ছে, আমি জোড়ামউ গাঁয়ের চন্ডীবক্সী, জীবনে অমন দুশ

পাঁচশ লোক খুন করেছি, তার উপর না হয় আরও একটা খুন হবে।"[১৭]

রেশমীকে উদ্ধারের জন্য খুন করতেও তার ভয় নেই। কিন্তু কেরীর বন্দুকের ভয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাবার সময় রেশমীকে জানিয়েছে -

" ভাবিস নে ছুঁড়ি তুই রক্ষা পেয়ে গেলি! আমি যদি জোড়ামউ গ্রামের চন্ডী বক্সী হই, তবে ভূভারতে যেখানেই তুই পালিয়ে থাকিসনা কেন, ঝুঁটি ধরে তোকে নিয়ে এসে চিতায় চড়াবই চড়াব।"[১৮]

এর পর শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ বাহাদুর, মোতিরায় সবার কাছে নালিশ জানিয়েছে। হাজার চোখ দিয়ে রেশমীকে খুঁজে একবার পেয়ে নৌকাযোগে আনবার সময় রেশমীর পলায়ন তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মোতিরায়কে রেশমীকে খুঁজে দিতে না পারায় মোতিরায় কর্তৃক তার লাঞ্ছনা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। চন্ডীবক্সী মোতিরায়কে ঠকানোর জন্য শাস্তিস্বরূপ বুধন সিংকে আদেশ করে -

" এই হারামজাদাকো লাগাও পঞ্চাশ জুতি। আর শালালোগকো মৎ ভাগনে দেও।"

লেখক চন্ডীর কপট ষড়যন্ত্র, তার লোভের পরিণতি ও মিথ্যে আশ্বাস দেবার পরিণাম নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। লেখকের কলমে চন্ডীবক্সী জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের জন চরিত্র ইংরেজ সমাজের প্রতিনিধি। জনস্মিথ বুদ্ধিসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী প্রেমের ব্যর্থতার জন্যই তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। কেটি, রোজ মেরী, এলমা, রেশমী প্রত্যেকেই তার প্রতি প্রসন্ন কিন্তু ভাগ্যদেবতা ছিল অপ্রসন্ন এজন্য জীবনে সে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে। জন বয়সে তরুণ, প্রেমে যুবক অভিজ্ঞতায় কিশোর। রেশমীর সঙ্গে প্রণয় রোমান্স বর্ণনায় লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত। স্ত্রী কেটির প্রতি দুর্ব্যোয়ার আচরণ সে মেনে নিতে পারে নি। রেশমীকে ভালবেসে সে বিবাহ করতে উদ্যোগী হলে বোন

লীজা বাধার সৃষ্টি করে। রেশমীর চিঠি তাকে বিচলিত করলেও চিঠির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেয়ে রেশমীকে পাবার জন্য তার যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধযাত্রা প্রেমবোধের সোচ্চার প্রকাশ। রেশমী যখন বহ্নুৎসবের আয়োজন করেছিল রেশমীকে বাঁচাবার জন্য জনের আর্তি —— "আমি ভুল বুঝেছিলাম, ভুল করেছিলাম, নেমে এস . . . এখনও সময় আছে নেমে এস নেমে এস।"

সে মেরিডিথকে জানিয়েছে রেশমীকে নামিয়ে আনতে গিয়ে অগ্নি শিখায় তার আত্মাহুতি অনেক বেশি কাম্য।

রেশমীর মৃত্যুর পর জন লীজাকে বিয়ে দিয়েছে মেরিডিথের সঙ্গে। বোম্বাইতে একটা কোম্পানীর চাকুরিতে যোগ দেবার আগে সে মেরিডিথকে জানিয়েছে -

" ফ্রেন্ড, আমার বোনটিকে তোমাকে দিয়ে গেলুম, এর চেয়ে মূল্যবান আমার আর কিছু নেই, ওর অযত্ন করনা, এমন নারী রত্ন বিরল। "

প্রমথনাথ জনচরিত্র অঙ্কনে শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে জন স্মিথ একটি রক্তমাংসে গড়া চরিত্র।

'কোপবতী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমল উচ্চশিক্ষিত কলকাতা থেকে সদ্য উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাগরিক জীবনের আবর্তে জড়িয়ে না পড়ে ফিরে এসেছে জন্মভূমি তালবনীতে। সবাইকে চমকে দেবার একটা প্রবণতা বিমল চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাঘ শিকার করতে গিয়ে বাঘের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই, বর্ষার ভয়ঙ্করী নদী কোপাই এ সন্তরণ প্রভৃতি বীররসের পরিচায়ক।

প্রকৃতি প্রেমিক বিমল প্রকৃতির অঙ্গনে বনলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে অংশ গ্রহণের সময় ফুল্লরাকে প্রেম নিবেদেন জানিয়েছে। প্রথম প্রেমের উন্মেষে সে তার ভারসাম্য হারায় নি। ফুল্লরাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন জানিয়েছেন। বিমলের প্রেম উজ্জ্বল অনেকটা প্রাণবন্ত - সে ফুল্লরার

প্রথম দর্শনে উপলব্ধি করেছে তার " কপোলে বেলফুলের স্বচ্ছতা, কণ্ঠে রজনীগন্ধার স্নিগ্ধতা, শতদলে প্রস্ফুটিত হয়ে শুভ্রতা বিস্তার করে ধ্যানাসনে জেগে রয়েছে। "

দাম্পত্যজীবনে সংসারের জটিলতা তাকে শান্তি দেয় নি, মান অভিমান দ্বন্দ্ব থেকেই মুক্ত প্রাণের লীলায় অবগাহন করেছে কাব্য কল্পনার রঙিন রঙে সে উদ্ভাসিত।

সঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতা, নৈকট্য থেকে ব্যবধানে ও বৈরাগ্য থেকে অনুভূতিতে বিমল কোপাই এর উৎসমুখ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা নিঃসন্দেহে প্রকৃতি প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। কোপাই এর প্রতি তার যে একটা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত নিবিড় আকর্ষণ আছে তাতে সন্দেহ নেই। মানসিক দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত, একদিকে কোপাই অন্যদিকে ফুল্লরা পরিশেষে সে মানুষকেও সার্থকভাবে পেলনা আবার প্রকৃতিকেও হারাল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিমল চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন —

" বিমলের জীবনে নদীর প্রভাব যেন অনেকটা কবিসুলভ কল্পনাবিলাস, নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণ নহে। মানুষের কামনাক্ষুব্ধ আবর্তের মধ্যে উদাসীন প্রকৃতিকে জড়াইতে হইলে উভয়ের মধ্যে যে নিবিড় আত্মীয়তা ফুটাইতে হয় এখানে তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। " [১৯]

সামগ্রিক বিচারে প্রমথনাথ বিশীর অঙ্কিত বিমল চরিত্র রক্তমাংসে গড়া চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হয় নি। ট্র্যাজিক চরিত্র রূপে বিমল প্রতিভাত হলেও চরিত্রটি সার্থক হয়ে ওঠে নি। চরিত্রটিতে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

'পদ্মা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনয়। শিক্ষাসূত্রে বিনয়কে যেতে হয়েছে কলকাতায়। প্রকৃতিপ্রেমিক বিনয়ের কাছে পদ্মা ছিল অত্যন্ত প্রিয়। পদ্মাবক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল চরচিলমারীর কঙ্কণ নামে এক মেয়ের সঙ্গে। হাঁস ফেরত দিতে গিয়ে আবার তাদের ঘনিষ্ঠতা ও অনুরাগের সঞ্চার ঘটে ও অসংযত আকাঙ্ক্ষার

ভ্রান্ত পথে এগিয়ে যায়।

বিনয় চরিত্র তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রমথনাথ দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ থাকলেই হয় না চরিত্রগঠনও আবশ্যক বিনয়ের মধ্যে ছিল চরিত্রশক্তির অভাব। কঙ্কণের প্রতি বিনয়ের দেহজ প্রেম এবং প্রেমের পরিণামে কিভাবে দুঃখ ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে বিনয় তারই প্রতীক।

বিনয় চরিত্র অনেকটা অসংযত, কঙ্কণকে ভালবেসে আবার কলকাতায় অধ্যয়নকালে পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে প্রেমের প্রত্যাখ্যান কঙ্কণের প্রতি পুনরাসক্তি জাগিয়ে তুলেছে। জীবনে দুবার অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্তের জন্য হিমালয়কে বেছে নিয়েও পারুলের সঙ্গে তার পরিচয় ও বিবাহের দিনে কঙ্কণের সাক্ষাৎ অতীত প্রেমের স্মৃতি এক বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়েছে। পদ্মাগর্ভে কঙ্কণের মৃত্যু ও পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়েছে। পদ্মাগর্ভে কঙ্কণের মৃত্যু ও পুত্রকে কোলে নিয়ে সে বেঁচে থেকে অনুতপ্ত হয়েছে। প্রমথনাথের বিনয় চরিত্রটি সজীব চরিত্র।

বনোয়ারীলাল 'পদ্মা' উপন্যাসের টাইপ চরিত্র। লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন। পাটের মরশুমে মহাজন সেজে সে কৃষকদের দাদন দিত। ছোট ছেলেমেয়েদের জলছবি, লজেঞ্চুস দিয়ে তাদের মন জয় করে ও চরের প্রতিবেশীরা তাকে 'বনোদাদা' নামেই ডাকত। সহজ সরল এই লোকটির মধ্যে যে পৈশাচিক প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকতে পারে তার আবির্ভাব মুহূর্তে তা বোঝা যায় নি। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন -

" লোকটার বয়স চল্লিশের উপরে - চীনা তসরের কোট গায়ে, ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও ছাতা হাতলে গামছা মুড়িয়া . - প্রতিবছর পাট চাষের মরশুমে দেখা দেয়।"

সে কঙ্কণকে বহুবার দেখেছে কিন্তু আকস্মিকভাবে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের

পেছনে তার সুতীক্ষ্ম চোখে ধরা পড়েছে কঙ্কণের অসামাজিক মাতৃত্ব। খলচরিত্রদের কথা ও আচরণে একটা বিশেষত্ব থাকে। তারণদাসকে সে জানাল -

"এই যে মুন্সীদাদা, প্রাতঃপ্রনাম। তারপর চিঠিপত্র কিছু আছে?" আসলে এবার সে দাদন দেবার পরেও স্বদেশে ফিরে যায় নি তার পাটের পালা শেষ হলেও পাটোয়ারের পালা শেষ হয় নি। কঙ্কণের বিয়ের সম্বন্ধ দিতে গিয়ে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে চেয়েছে - যত্রতত্র কঙ্কণের সঙ্গে আলাপ কঙ্কণের গৃহের দুয়ারে রাতে আগমন ঘটনা ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। কঙ্কণকে সে অভদ্র ও অশ্লীল ইঙ্গিত কঙ্কণের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। তারণদাসের মৃত্যুর জন্য সেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী কঙ্কণের দুঃসংবাদ সে তারণদাসকে জানিয়েছে। আবার প্রতিবেশীকে জানিয়েছে ব্রহ্মদত্তির মতে বনোয়ারীলাল ক্ষতি করেছে কঙ্কণের। প্রমথনাথের কলমে এরূপ খলচরিত্র বাস্তবসম্মত ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তার আচার আচরণ সংলাপ খলচরিত্রের উপযোগী হয়ে উঠেছে। সমাজজীবনের এরূপ সুযোগসন্ধানী খলচরিত্রের অভাব নেই।

'কোপবতী' উপন্যাসের নায়িকা ফুল্লরা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ফুল্লরা বনলক্ষ্মীর প্রতীক স্বরূপা তার মধ্যে নারীসুলভ রমণীয়তা ফুটে ওঠে নি। তার চিত্তের প্রেম সুপ্ত বরফের মত জমাট। তবুও স্থানে স্থানে চরিত্রটিতে লেখক সজীবতা দান করেছেন। বিমলের আরোগ্য কামনায় সে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে কঙ্কালীতলায় জাগ্রত দেবীর পূজো দিয়েছে। কোপাই এর তীরে বিমলকে বেলফুল দিয়ে প্রেমকে স্বাগত জানিয়েছে। এর মধ্যে নারীসুলভ রমণীয়তা ফুটে উঠেছে। ফুল্লরার ভালোবাসা ছিল গভীরতর। দাম্পত্য জীবনে সাংসারিক দায়িত্বভার নিয়ে ভালবাসা নতুন মাধুর্য লাভ করেছে। কখনও তার মনে জেগেছে হীনমন্যতাবোধ, সে গ্রাম্য মেয়ে শিক্ষিত নয় এজন্যই বিমলের মনের মত হতে পারে নি। দুজনের রোমান্টিক প্রেম দাম্পত্য জীবনে মান অভিমান সৃষ্টি করেছে তবুও ধৈর্যশীলা ফুল্লরা তা মেনে নিয়েছে। কোপাই

এর উৎস সন্ধানে বিমলের যাত্রায় সে দুঃখিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিমলের প্রকৃতির প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ উপলব্ধি করে সবকিছু মেনে নিয়েছে। তবে বিমলের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছে এবং মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়ে তালবনী ছেড়ে নলহাটির দিকে যাত্রা করেছে। লেখক ফুল্লরার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ফুটিয়ে তুললেও চরিত্রটি সামগ্রিক বিচারে পূর্ণতা দান করে নি।

কঙ্কন 'পদ্মা' উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রটি কারুণ্যমিশ্রিত। একদিকে বালিকা সুলভ চাপল্য ও জীবনসংগ্রামী নারী চরিত্র কঙ্কণের প্রেম ও যন্ত্রণার বিচিত্র দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়েছে। সরলতা, মাধুর্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ত্রিবেণীতে কঙ্কণ চরিত্রটি অদ্বিতীয়া। কঙ্কণ ধরা দিয়েছিল বিনয়ের প্রেমে, তার সঙ্গে কামনা বাসনা ছিল যুক্ত। বিনয়ের কলকাতা যাত্রার সংবাদ শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। কঙ্কণ চরিত্রের এক গভীর জিজ্ঞাসা যুক্ত হয়েছে।

অসামাজিক মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে নি, সে বিচলিত হয়েছিল বনোয়ারীলালের লুব্ধ দৃষ্টিতে। বনোয়ারীলালের বিবাহের প্রস্তাব কঙ্কণের অসম্মতিতে ব্যর্থ হয়ে গেলে সে জানায় তারণদাসকে ও প্রতিবেশীকে এর ফলশ্রুতি হল তারণনদাসের মৃত্যু। জীবনযন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়েও সে মৃত্যুর পথকে বেছে নেয় নি তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন বিনয় আসবেই। তার সংস্কার মুক্ত মন আধুনিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। বসন্তরোগে তার লুপ্তশ্রী মুখমন্ডল বিনয়কে দেখায় নি বিনয়ের করুণ আবেদনেও সে সাড়া দেয় নি।ইতিমধ্যে শিশুপুত্রকে পেয়ে আশার আলো সে দেখতে পেয়েছিল। পারুলের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ের দিনে টোপর পৌঁছাতে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ অন্তিম মুহূর্তেপদ্মা বক্ষে তার স লিল সমাধি আকস্মিক হলেও তা নিয়তির লীলা মাত্র। বিনয় কঙ্কণকে হারিয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করেছে। লেখক কঙ্কণের করুণ পরিণতি দেখিয়েছেন শিল্পের প্রয়োজনেই তাকে এটা করতে

হয়েছিল। লেখক কঙ্কণ চরিত্রটি অঙ্কনে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

'পদ্মা' উপন্যাসের প্রতিনায়িকারূপে পারুল চরিত্রটি লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি। নাগরিক সভ্যতার ধন প্রাচুর্যে পারুল বড় হয়েছে। পিতা অবিনাশ বাবু কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। ইতিহাসে অনুরাগী পারুল পিতার স্নেহের পাত্রী। বিনয়ের প্রতি তার প্রেম ছিল কৌতুক ও কৌতূহলের বিষয়। সে বিনয়ের প্রেমে স্বীকৃতি দিয়েছিল একটি গোলাপফুলের কুঁড়ি দিয়ে। প্রেম যে বিবাহের সঙ্গে যুক্ত এটা পারুল উপলব্ধি করে বিনয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের তিক্ততা শুরু হয়। লেখক এখানে নারী মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। পরমেশের সঙ্গে পারুলের সিনেমা যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিনয়ের মনে জেগেছিল নৈরাশ্যবোধ। বিনয় নিজেকে অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করে। এর পর পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে আসে রাজসাহীতে।

আবার আকস্মিকভাবে বিনয়ের সঙ্গে দার্জিলিংএ সাক্ষাৎ ও অতীত স্মৃতির সূত্র ধরে বিবাহ স্থির হয়। পারুলের বিয়ের দিনে কঙ্কণের শিশুপুত্রের প্রতি স্নেহ তাকে নারীত্বের মহিমায় ভূষিত করে। প্রমথনাথ বিশী পারুল চরিত্র অঙ্কন করে কঙ্কণ চরিত্রের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। পারুল চরিত্রটি লেখকের কলমে সজীবতা দান করেছে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের তুলসী চরিত্রটি লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হিসেবে তুলসীর জীবনের ঘাত প্রতিঘাত লেখক বর্ণনা করেছেন। সুখানন্দ পন্ডিতের পালিত কন্যা তুলসী চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে লালিত পালিত হয়ে তুলসীর জীবনে নারীসুলভ মাধুর্যতা ফুটে উঠেছে প্রমথনাথ বিশী উপন্যাসে যেমন পান্নাবাঈ, রুমালী, খুরশিদজান চরিত্র অঙ্কন করেছেন কিন্তু তুলসী চরিত্র তাদের তুলনায় বৈপরীত্য দান করেছেন।

তুলসী জন্মনিঃসঙ্গ। শৈশবে মাতৃহারা তুলসী ভুতিবুড়িও সুখানন্দের স্নেহলালিত্যে বর্ধিত। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর শাহজাহানাবাদে রূপসী নারীদের এক অনিশ্চিত জীবন কাটাতে হয়েছে।

স্বরূপরামের সঙ্গে তুলসীর বিবাহের বাধা সৃষ্টির কারণ হল কোম্পানীর আনুগত্য। দুধে আলতা রং ও সুঠাম দেহ, সাহসী ও বুদ্ধিমতি তুলসীকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে মীর্জা গালিবের গৃহে রেখে আসবার অব্যবহিতপরেই সিপাহীরা তাকে হরণ করে মেম সাহেব ভেবে খুন করবার জন্য লালকেল্লায় নিয়ে যাবার পর কোনভাবে সেখান থেকে ফুলকিমন্ডিতে - পৌঁছাতে গিয়ে পথে আবার সে লুঠ হয় সেখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় রুমালীর কুঠিতে। জীবনে বারবার তাকে অপহৃতা হতে হয়েছে রূপসী মেয়েদের এটাই ছিল তৎকালীন সময়ের ভাগ্যলিপি। রুমালী তুলসীকে 'বহিন' মনে করে প্রথম পরিচয় রুমালী গুনগুন করে তুলসীকে গান করে—

" ছোটি ছোটি তুলসী গাছিয়া
লম্বী লম্বী পাতিয়া
ফরে ফুলে তুলসী
শুহারণ রেথী।"

দেহ ও মনে তুলসী যুবতী জীবনলালের সঙ্গে তুলসীর ঘনিষ্ঠতা সর্মথন করেনি রুমালী। সুখানন্দ তার সংবাদ পেয়ে এলে পিতার সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ে সান্ত্বনা পায় সে। রুমালীর কুঠি থেকে পিতার সঙ্গে ফিরে যায় নি সে। সুখানন্দের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে তুলসী শুধু রূপবতী নয় গুণবতীও। লেখাপড়া, নাচ, গান, উলবোনা, নক্শা তোলা সব কাজেই সে দক্ষ। জীবনলালকে সে ভালোবেসেছে ঔপন্যাসিক তুলসীর্র প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন

" তুলসীর প্রেম নবাঙ্কুরিত বনস্পতি, তার গতি ধীর, তার বুদ্ধি মন্থর, সে প্রেম সার্থকতার জন্য অপেক্ষা জানায়, তুলসীর প্রেম পাহাড়তলীর সরোবর ভরিয়ে দিতে চায়। তুলসীর প্রেমে তৃষ্ণা নিবারণ।" তুলসী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে জীবনলাল প্রেম নিবেদনে জানায় - " আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি তুলসী।" পিতাকে সে বুদ্ধিদীপ্তভাবে জানায় - "

অধিকার কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়।" তুলসী জীবনলালের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে রুমালী তার কেমন বোন তবে প্রেমের প্রতিযোগিতায় সে জানাতে বাধ্য হয়েছে রুমালী ভাল মেয়ে নয়। রুমালী সুখানন্দের ঘরে এসে জানিয়েছে জীবন কোম্পানীর রেসেলদার। এই সংবাদে নয়নচাঁদ ও সুখানন্দ জীবনলালের উপর রুষ্ট হতে পেরে ভেবে তুলসী শ্যামসুন্দরের চরণে প্রণাম জানায় ও সন্ধ্যাবেলায় আরতি নৃত্য করে —

" মীরা দাসী জনম জনম কী

পটী তুম্হারে পায়।"

— লেখক তুলসী চরিত্রে ঈশ্বর অনুরাগের দিকটি তুলে ধরেছেন।

এর পর তার স্বগত উপলব্ধি — " কোন কুমারী না নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে জীবনের মত স্বামী পেলে?" জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সে পরিণতবয়স্কাদের মত সংসারের রূপ উপলব্ধি করেছে নয়নচাঁদ তুলসীর পরিবর্তন দেখে তুলসীকে জানালে তুলসী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে — " আত্মরক্ষার তাগিদে বানের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাতারাতি বেড়ে ওঠে পদ্মের নাল।" জীবনলাল বাদশাহী সেনা কর্তৃক গ্রেপ্তার হলে সারেঙ্গী বেশে এসে তুলসীকে জানিয়ে যায় তার বিবাহের সম্মতি সেই সঙ্গে তক্তিটাও দিয়ে যায় তুলসীকে। সুখানন্দের মৃত্যুর পর শাহজাদা আবুবক্কর তুলসীর শ্লীলতা হানির চেষ্টা করলে ক্রোধে, অপমানে, ভয়ে, সঙ্কোচে আর্তনাদ করে নতজানু হয়ে তদগতস্বরে কৃষ্ণকে স্মরণ করে মহাভারতের শ্লোক পাঠ করে অজ্ঞান হয়, জ্ঞান ফিরে পেয়ে জীবনলালকে দেখে আর্তোল্লাসে চীৎকার করে ওঠে - "জীবন তুমি এসেছে।" জীবন তুলসীকে প্রেমানুরাগে আবদ্ধ করে। এরপর হডসনের গুলিতে জীবনলালের মৃত্যু হলে তুলসীর কাছে এঘটনা থাকে অজ্ঞাত। জীবনলালের আগমন প্রত্যাশায় বিয়ের পিঁড়ি ও সিঁড়িতে শঙ্খ, পদ্ম, লতাপাতার আলপনা আঁকে। অবসর সময়ে শ্যামসুন্দরের

আরাধনায় মগ্ন থাকে - দূরে পদধ্বনি শুনে জীবনলালের আগমন প্রত্যাশা করে। পান্না ও তুলসীর বিরহবেদনা লেখক অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তুলসীর কার্যকলাপ ও তার জীবনের সংঘাত মুখর অধ্যায়গুলিকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। 'লালকেল্লা'র অন্যতম নারী চরিত্র তুলসী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসের নিস্তারিণী, সর্বেশ্বরী, অম্বিকাদেবী ও ক্ষেন্তবুড়ি জননী চরিত্র হিসাবে পরিচিতা। নিস্তারিণীদেবীর সন্তান বাৎসল্য, সর্বেশ্বরীর পুত্রের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা ও স্বামী অবিনাশের সঙ্গে কলহ, অম্বিকাদেবীর স্বামী ভক্তি, ক্ষেন্ত বুড়ির সন্তান ও পালিতা কুসমীর জন্য অপত্য স্নেহ, বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসে শচীন, সুশীলের প্রতি বিন্দুবাসিনীর বাৎসল্য, রুক্মিণীর বিয়ের ব্যাপারে নিস্তারিণীর তৎপরতা ও স্বদেশ প্রেমিক স্বামীর প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা পাঠক মনে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের বাঈজী খুরশিদ জান ও পান্না পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। বাদশাহী আমলে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে বাঈজীদের গৃহ ছিল প্রশস্ত। খুরশিদ জানের ও পান্নার নৃত্য গীত ও গজলগুলো তৎকালে বিভিন্ন জনের মুখে মুখে উচ্চারিত হত ।তার রূপ সম্বন্ধে মুখে মুখে একটা ছড়া চলতো।

খুরশিদের গৃহে শেখবানু, মীর্জা মোঘল, কুলিজ খাঁ, আলি খাঁ , নয়ন চাঁদ ও সূরযপ্রসাদ এসে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। রাজ্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা কালে সবাব খুরশিদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে সে মুসকিলকে আসান করে দিতে পারে।

রামজানি সম্প্রদায় ভুক্ত পান্না সুশীলা, চরিত্রযুক্তা, বুদ্ধিমতি, রহস্যময়ী নারী সে স্নেহময়ী, বীরাঙ্গনা সাধিকা। হরপার্বতীর অভিশাপে রামজানি সম্প্রদায়ভুক্ত পান্না বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করেছে। তার নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা সাধ্বী নারীর চেয়েও কোন অংশে কম নয়।

রুমালী লালকেল্লার একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। অল্পবয়সে তার মাকে হারিয়ে দুধ বিক্রয় করে দিন অতিবাহিত করে । তার রূপ, সাহস, বাক্‌পটুতা, ধর্মনীতি ও নির্লজ্জ ইন্দ্রিয় পরায়ণতা সব মিলিয়ে সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী চরিত্র। পাপ বোধ বলে তার অনুভূতি নেই। সে অর্থের প্রলোভনে কিংবা বাধ্য হয়ে নয় সুখের জন্য শাহজাদার কাছে সে যেত। তার ধারণা ভোগ করে দেহ, আত্মা তার অপবিত্র নয়। দুধের ভার মাথায় নিয়ে যেতে দুধের ভার দুলছে অথচ পড়ে যায়না এভাবে ব্রিজম্যান ও জোনসের অফিসে এলে গোয়েন্দা সন্দেহে কোম্পানীর লোকদের থেকে দূরে থাকতে বলা হলে নির্ভয়ে সে জানিয়েছে যেখানে লোকজন বিক্রিতো সেখানেই হবে যেখানে বনের গাছপালা সেখানে কে দুধ কিনবে? সে জানায় তার বাবা ইংরেজ মা কাশ্মীরের মেয়ে তার বাবা মা ভাইকে খুন করেছে সিপাহীরা ।

রুমালী জীবনলালকে ভালবেসেছে — প্রতিদ্বন্দ্বী তুলসীকে উপেক্ষা করে দেহকে অবলম্বন করে জীবনলালকে পেতে চেয়েছে। আবার কখনও শ্যামসুন্দরের কাছে জানিয়েছে তার আত্মনিবেদন। কখনও জীবনলালকে জানিয়েছে - "তুলসী কে ? তুলসীর কি আছে ? তোমার মত লোকের যোগ্য নারী আমি।" জীবনলাল তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে — সে অকপটে জানিয়েছে "জীবন, জীবন, তুমিই আমার সব, তুমিই আমার সর্বস্ব, যেখানে খুশি আমাকে নিয়ো চলো, যা খুশি আমাকে শাস্তি দাও , আমাকে মারো, আমাকে খুন করে ফেলো, শুধু বলো যে, আমাকে ভালোবাসো।" লেখক রুমালীর মনস্তাত্ত্বিক দিক নিপুণভবে বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনলালের হডসনের গুলিতে মৃত্যু হলে সে ইংরেজের নিশানদন্ড খুলে গুলিবিদ্ধ রুমালী মৃত জীবনলালের বুকের উপর পড়ে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছে। লেখক দেখিয়েছেন জীবিত অবস্থায় জীবনলালের সঙ্গে রুমালীর মিলন না হলেও অন্তিমকালের মিলনদৃশ্য নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। উপন্যাসিক - রুমালী চরিত্রটিকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

একজন বারাঙ্গনার মধ্যেও যে প্রাণের উচ্ছ্বাস একজনকে ভালোবেসে সংসারের আলো খুঁজে পেতে চায় তার নিদর্শন রুমালী চরিত্র। শরৎচন্দ্রের বাঈজী পারু ও এভাবে ভালোবেসেছিল।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের ভুতিবুড়ি সুখানন্দের পরিচারিকা। দু একটি অধ্যায়ে তার ক্ষণকালের জন্য উপস্থিতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাবনা জেলায় তার প্রথম জীবন কেটেছে এজন্য পাবনার আঞ্চলিক ভাষার টান দিল্লীতে দীর্ঘকাল থেকেও ভুলতে পারে নি। সুখানন্দের গৃহের মাতৃহারা পালিতা কন্যা ও নয়নচাঁদের অভিভাবিকা ভুতিবুড়ি। তার সংলাপগুণে ও সক্রিয়তায় চরিত্রটি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে।

চাঁপা চরিত্রটি লেখকের রোমান্সরাজ্য থেকে আমদানি করা ইন্দ্রাণীর পরিপূরকরূপে কল্পিত। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা ইন্দ্রাণীর সে অভিভাবিকা স্বরূপ। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরন্তপের বিবাহের ঘটকালি ও কৃতিত্ব চাঁপারই প্রাপ্য। বয়স তার ত্রিশের কাছে অবিবাহিতা। সৌন্দর্যে জোৎস্নাভিষিক্ত নদীর স্রোতের মত তরল, চঞ্চল এবং সহজ প্রাপ্য বুদ্ধিমতী চাঁপার ছলাকলায় পরন্তপ ধরা পড়েছে। সে জানে বিবাহ বহির্ভূত প্রেম মৃগ তৃষ্ণিকার মরীচিকার মত। সাপুড়ে যেমন সাপের ছোবলে মরে, বাঘ শিকারী যেমন বাঘের হাতে মরে তেমনি প্রেম ব্যবসায়ী মারা যায় প্রেমের আঘাতেই।

জমিদারবাড়ির বাইরে পরন্তপ ও চাঁপার অবৈধ মেলামেশা ইন্দ্রাণী ব্যতীত সকলেরই জানা। যেদিন এ সত্য ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে সেদিন থেকে পরন্তপের রক্তদহের জমিদার বাড়ির দেউড়ি বন্ধহয়ে যায়। পরন্তপ চাঁপাকে নিয়ে পারকুলে আশ্রয় গ্রহণ করে। দু বছর বাদে চাঁপার একটি মেয়ে হয় নাম তার সুজানি। তার জন্মের পর চলনবিলের চর মাথা তুলে দাঁড়ায় এজন্য দুবছরের মেয়েকে পরন্তপ তুলে আছার মারে সেবার বহুকষ্টে বেঁচে উঠলে

চাঁপাকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। পরন্তপ জেনেছে সুজানি বেঁচে নেই। পরন্তপ ড়াকুরায়ের পালিত কন্যা কুসমির শ্লীলতা হানির চেষ্টা করলে অর্ধোন্মাদিনী চাঁপা পরন্তপকে ছুরিকা বিদ্ধ করে হত্যা করে । ক্রোধে বশবর্তী হয়ে সে বলে—

" এই সেই ছুরি , যেখানা রেখেছিলি আমাকে মারবার জন্যে, আমার সুজানিকে মারবার জন্যে ! তোর ছুরি আজ তোকে ফিরিয়ে দিলাম।" পরন্তপের মৃত্যুর পর বৈষ্ণবীদের মুখে শুনেছে কুসমি আসলে সুজানীনামে তার মেয়ে। লেখকের চাঁপা চরিত্রটি বাস্তবোচিত হতে পারেনি। তবুও তার সক্রিয়তা ও সংলাপ উপন্যাসের রসহানি ঘটায়নি।

বালবিধবা কুসমি চরিত্রটি লেখকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। আধুনিক যুগ লক্ষণাক্রান্ত কুসমির স্বপ্ন মধুর কৈশোর প্রেম পরিণামে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাল্যকালে তারা তিন সঙ্গী দীপ্তিনারায়ণ ও মোহনের সঙ্গে আনন্দমুখর দিন কাটিয়েছে। তিন বছর বয়সে তার স্বামীর মৃত্যু হলে সন্তানহীন ডাকু রায় তাকে নিজকন্যার মত করে স্নেহ ও যত্নে লালিত পালিত করে। উপন্যাসের এক অংশে কদম কুসমি সম্পর্কে ডাকুরায়কে জানিয়েছে—

"মেয়েটি দেখতে যেমন সুলক্ষণা তেমনি বুদ্ধিমতি।" বলাবাহুল্য কুসমির পূর্বনাম সুজানি পিতা পরন্তপ রায় মাতা চাঁপা। পরন্তপের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যই অন্যত্র আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলে ঘটনাক্রমে সে ডাকুরায়ের পালিত কন্যারূপে ধুলোউড়ির কুঠিতে আশ্রয় লাভ করে।

মোহনের সঙ্গে তার স্বপ্নরঙিন দিন কাটে কখনো নৌকাভ্রমণে, কখনো দূরবীন দেখে কখনো মোহন কুন্দ ফুল ও পদ্ম দিয়ে বধূরূপে সাজিয়ে। কুসমির দেহ জেগেছে মন জাগেনি। নবযৌবন সমাগতা কুসমির সঙ্গে মোহনের স্বপ্নমধুর প্রেমের স্পর্শে যৌবনের প্রথম তরঙ্গে কুসমির রোমাঞ্চ জাগে। নারীদেহের উন্মেষের সঙ্গে পুরুষের মনে ভাষা সে বুঝতে শিখেছে ।

ডাকুরায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্র ধরে পরন্তপের কামনালোলুপ দৃষ্টি তাকে বিব্রত করে তোলে; ডাকুরায় কুসমির জন্য পাত্রের সন্ধানে রায়নগরে গেলে মোহন ও কুসমি বেণীরায়ের ভিটার জাগ্রত কালীমন্দিরে পুজা দিতে গেলে আকস্মিক ভাবে পরন্তপ কুসমিকে নৌকায় তুলে নিয়ে যায় পারকুলে। কুসমির শ্লীলতা হানি করতে উদ্ধত হয় কুসমি পরন্তপকে জানায় তার করুণ মিনতি ঃ

" আমি আপনার মেয়ের সমান। আপনি আমার পিতার সমান। " তবুও পরন্তপের উদ্ধত হাত থেকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের স্মরণ নেয় ও অভ্রভেদী স্বরে চীৎকার করে বলে—

" মা মা জননী , কোথায় তুমি রক্ষা কর। " চাঁপা পরন্তপকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করবার পর সে আশ্রয় নেয় ধুলোউড়ির কুঠিতে । তখন বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কথোপকথন কালে বুঝতে পেরেছে সে বিধবা। মোহনকে সে জানিয়েছে — " মোহনদা আমি বিধবা। " তার পরণে শাদাথান, মাথার চুল ছাটা অঙ্গ নিরলঙ্কার। কুসমির অব্যক্ত বেদনা প্রকাশিত হয়। বিধবার বিবাহ আইনসম্মত হলেও লেখক কুসমি ও মোহনের বিয়ে দেননি। উভয়ের প্রেম বিচ্ছেদ বেদনায় অপূর্ণতা দান করে। লেখকের কুসমি চরিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে।

ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাণ চেতনা

কথাশিল্পী প্রমথনাথের উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইতিহাস চেতনা, ভূগোল ও পুরাণ চেতনা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ভৌগোলিক পটভূমি হিসেবে লেখক যে স্থান গুলি বেছে নিয়েছেন সেখানকার ভৈগোলিক বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে লেখকের শিল্পবোধের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

'জোড়দীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসে পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা , কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার

চিত্র, 'পদ্মা' উপন্যাসের আড্ডার আসরে বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত এছাড়া 'লালকেল্লা' উপন্যাসে অশোকস্তম্ভ, কুতুবমিনার এর ঐতিহাসিক তথ্য থেকে শুরু করে মৌর্য সম্রাট, রাজপুত তোমর বংশ, চৌহান রাজপুত, চৌহান, দাস, খিলজী, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী, শুর, মোঘল যুগের থেকেই রাজধানীর নামকরণ হয়েছে শাহজাহানাবাদ, এর উত্তরে কুরুক্ষেত্র পানিপথ। আকবর সিংহাসনে আরোহণ করে ফতেপূর শিকরি, আগ্রার দুর্গ, জামা মসজিদ, হুমায়ুনের সমাধি, দেওয়ান-ই-খাস নির্মাণ করেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করে যমুনার পশ্চিমতীরে নূতন কেল্লা নির্মাণ করে নামকরণ করলেন লালকেল্লা — শাহজাহানাবাদই মোঘল শাসনের সর্বশেষ রাজধানী। দিল্লীর লালকেল্লা বিশ্বের সবচেয়ে সুরম্য সূক্ষ্ম অলঙ্কার শোভিত রাজপ্রসাদ। মুঘল স্থাপত্যশিল্পের অনুপম নিদর্শন দেওয়ান-ই-খাস। এছাড়া চৌদ্দটি বড়, চোদ্দটি ছোট দরবাজা। প্রথমে সাত মাইল জুড়ে লাল পাথরে নির্মিত হয়েছিল প্রাচীর । এর পর ১৮১১ সালে প্রাচীর সংস্কার করে নির্মিত হল চাঁদনী চক পর্যন্ত সড়ক, ফুলকি মন্ডিতে নানা রং বেরং এর সুগন্ধযুক্ত ফুলের সমারোহ, লাহোরী দরবাজা, কাবুল দরবাজা, রোশেনারা বাগ, সোনেরি মসজিদ প্রভৃতি। লালকেল্লা নির্মাণ হতে সময় লেগেছিল নয় বছর, ব্যয় হয়েছিল এক কোটি টাকা। লাল পাথরে নির্মিত বলেই এর নাম হয়েছে লালকেল্লা। এছাড়া কিল্লাই মুবারক, কিল্লা-ই-শাহজাহানাবাদ, কিল্লা-ই-মুআল্লা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। অস্টকোণ গড় যুক্ত তিন হাজার ফুট দীর্ঘ লালকেল্লার প্রসাদ দূর্গ। এর পূর্বদিকে অবস্থান করছে মোতি মহল, হামাম, রঙমহল, মমতাজমহল প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্প। বাদশাদের ঝরোকা দর্শনের বর্ণনা থেকে সম্রাট শাহজাহানের আড়ম্বরের সঙ্গে লালকেল্লার প্রবেশের মনোগ্রাহী তথ্য লেখক নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। কোম্পানী ফৌজ বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে লালকেল্লা দখল করে ২০শে সেপ্টেম্বর এই ঐতিহাসিক তথ্য ও উল্লেখ করেছেন লালকেল্লা উপন্যাসে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে কলকাতার নামকরণের উদ্ভব থেকে রাস্তাঘাট, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিক্ষাব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে রাজসাহী, দিনাজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস,স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বর্ণনা দিয়েছেন নিপুণভাবে।

লেখকের পুরাণ চেতনার অজস্র প্রমান মেলে বিভিন্ন উপন্যাসে ।চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য কিংবা ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে কখনও ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত থেকে শুরু করে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, রঘুবংশম্ প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক ব্যবহার করে পুরাণ চেতনার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

প্রমথনাথ 'লালকেল্লা'য় ভারতের মানচিত্রের যে অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে ভূগোল চেতনার সঙ্গে সাবলীল ভাষাশৈলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার কলকাতা, বীরভূমের কোপাই নদীর উৎস থেকে বীরভূমের ভৌগোলিক চিত্র, রাজসাহীর চলনবিল, পাবনা জেলার প্রকৃতি, পদ্মা নদী যমুনা, গরল প্রভৃতি শাখানদীর বর্ণনা, লক্ষ্ণৌ, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানের অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন এতে লেখকের ভূগোল চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক ইতিহাস চেতনা, ভূগোল এবং পুরাণ চেতনা বিভিন্ন উপন্যাসে উপস্থাপিত করে বাংলা সাহিত্যে রেখে গেলেন এক অক্ষয় সম্পদ যা গর্তানুগতিক উপন্যাস থেকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

নিসর্গচেতনা

উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় জীবনের সামগ্রিক রূপের বিশ্লেষণ, নানা অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের রূপ সেখানে কুঁড়ি থেকে পাপড়ির মত ধীরে ধীরে

বিকশিত হয়ে ওঠে। অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রের সমবায়ে জীবনের বিচিত্র রাগিনী বেজে ওঠে সব কিছুরই পেছেনে যে বিষয়টি অবস্থান করে থাকে তাহল প্রকৃতি, ভূখন্ড ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। ঔপন্যাসিক যতই বাস্তববাদী তথা অবজেক্টিভ দৃষ্টিতে দেখুন না কেন প্রকৃতি কম বেশি তাকে আকৃষ্ট করবেই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক ঔপন্যাসিক রচনায় তাই প্রকৃতির একটি বিশেষ স্থান আছে।

বিশ্ব সাহিত্যের অনেক মহৎ শিল্পীর মতই কথাশিল্পী প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে প্রধানত ব্যবহৃত হয় উপন্যাসের পটভূমি গঠনে, প্রতীকরূপে, আলঙ্কারিক প্রয়োজনে, পরিবেশের সহায়করূপে কিংবা বর্ণনার আনন্দে। ঔপন্যাসিক কখনও প্রকৃতিকে দ্যোতকরূপে, অদ্যোতকরূপে, প্রকৃতি ও মানুষের অখন্ড রূপ পরিবেশনে, কখনও রহস্যানুভূতিতে আধ্যাত্মিক চেতনায় আবার মানবভাগ্য নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। কোন লেখক জীবনের বাস্তবতা থেকে পলায়নের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করেননি বরং বাস্তব থে কে পরবাস্তবের দিকে এগিয়ে গিয়ে মানবমনের গভীরে পৌঁছেছেন। কাজেই প্রকৃতি উপন্যাসের একটি শিল্পমনের সৃষ্টি ও বিশিষ্ট শিল্প উপকরণ যা উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিকের শিল্পীমন আমাদের চিনিয়ে দেয়। প্রকৃতির অনুভব ও পরিবেশনরীতির বৈচিত্র্য অনুসারে লেখকে লেখকে যেমন স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায় তেমনি একজন লেখর্কের গ্রন্থে গ্রন্থে প্রকৃতিচিত্রণ স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, বনফুল, সমরেশ বসু, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, নারায়ণ, জীবনানন্দের প্রকৃতি চেতনা আলাদা আলাদা। প্রমথনাথের প্রকৃতি চেতনা কতটা স্বাতন্ত্র্যতার দাবী রাখে এই অংশে আমাদের এটাই প্রধান বিচার্য।

নির্সগের পটভূমিরূপে রুদ্র ও মধুর রূপ মানবচরিত্রের স্বরূপ ও তার পরিণতির সঙ্গে যুক্ত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে মানব চরিত্রের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিরূপে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করলেন তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুদ্ধি রসজাত প্রকৃতি, বিভূতিভূষণের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, প্রাত্যহিক জীবনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বপ্রকৃতির মহিমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমারের প্রকৃতির প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি, বুদ্ধদেবের প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, জীবনানন্দের পরাবাস্তব প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতি চিত্রের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে, প্রমথনাথকে নিসর্গভাবনা কতটা তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে সেটাই আমাদের কাছে মূল বিচার্য।

প্রমথনাথ নিসর্গপ্রেমিক। তার শিল্পী সত্তার সঙ্গে প্রকৃতি চেতনার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি ও সৌন্দর্যানুভূতি উপন্যাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক প্রমথনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক প্রমথনাথের শিল্পরচনায় প্রাকৃতিক উপকরণগুলি বিশিষ্ট প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরছি—

" এই দরদী প্রণয়ীযুগলের মধ্যে সকৌতুক স্মিতহাস্য — শীতের কুয়াশা ভেদ করিয়া তাহা ফুটিল— ধীরে ধীরে ঘনায়মান অন্ধকার স্পর্শ দিয়া এই দুটি প্রণয়ীকে পৃথিবীর উপর থেকে একেবারে মুছিয়া গেল।"[২০]

উদাহরণটি 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের । পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লেখক চন্দ্রালোকের অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনা করে পিনাক ও সীতার প্রেমভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ও রূপের দ্যোতনা প্রকাশ করেছেন।

'আবার শীতের কুয়াশা ভেদ করে' 'ঘনায়মান অন্ধকারে স্পর্শ দিয়া' আসন্ন সন্ধ্যার নির্জনতায় প্রেমের প্রতিভাসরূপে দেখা দিয়েছে। অনন্ত প্রতীক্ষার অবসরে দুই রোমান্টিক নায়ক নায়িকার মধ্যে মিলন মুহূর্তে দ্যোতক প্রাকৃতিক চিত্র গভীরতা দান করেছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাহায্যে 'কোপবতী' উপন্যাসে পটভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে কতটা অনবদ্যভাবেঃ—

"বাসন্তী রঙের শাড়ীকে আর ওড়নায় ফুল্লরাকে স্বয়ং বনলক্ষ্মীর মত দেখাইতেছে— ওড়নার ফাঁক দিয়া ঝাঁচুলির কচি কলাপাতার রং দেহের গৌরবর্ণকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে; ভেজা চুলের রাশ দুলিতেছে — কাঁধের উপর দিয়া দুচার গাছা বুকের উপড়ে আসিয়া পড়িয়াছে; চোখের সিক্ত পক্ষগুলি পরস্পর জুড়িয়া আছে; শুভ্র গ্রীবাতে দুচার ফোটা জল।"[২১]

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ লিপি পেয়ে কোপাই-এ স্নান সেরে বনলক্ষ্মীর সাজে সজ্জিত হয়েছে। ফুল্লরার অনিন্দ্যসুন্দর গৌরবর্ণ অঙ্গে বাসন্তী রং-এর শাড়ীও ওড়নায়, ভেজাচুল, চোখের সিক্ত পক্ষ ও গ্রীবার জলবিন্দু অনন্যতা দান করেছে।

নায়ক নায়িকার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির স্বরূপ পরিবর্তন কতটা সম্পৃক্ত হয়ে আছে নিম্নোক্ত বর্ণনায় সার্থকতা লাভ করেছে —

" ওপারে বন হইতে শালফুলের নেশাধরা গন্ধ , এপারের বন হইতে আমের মুকুলের স্বপ্ন লাগানো সৌরভ; ওপারের বনের ছায়া — এপারের বনের আলো; ওপারের বনের টিট্টিভ— এপারের বনের কোকিল; ওপারের নিস্তব্ধতা— এপারের নির্জনতা — আর মাঝখানে কালো নদী কোপাই।"[২২]

জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রিতে ফুল্লরা ও বিমল কোপাই নদীর তীরে বসে দুই তীরের আলো আঁধারি রূপ বৈচিত্র্য তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। শব্দ, বর্ণ, গন্ধ

এনে দিয়েছে বৈচিত্রতা। শিল্প উপকরণের ক্ষেত্রে বর্ণনাটি দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে বিমলের মনে প্রাকৃতিক রহস্যের সংমিশ্রণ কতটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের বর্ণনায়—

" অনেক রাত্রি হইয়ছে দেখিয়া বিমল ফিরিতে যাইবে এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল অদূরে পলাশ মহুয়া গাছের একটা কুঞ্জে র মধ্যে একজনকে যেন বসিয়া আছে, মূর্ত্তিটি রমণীর, তার মুখ দেখা যাইতেছে না, তার মুখ দেখা যাইতেছে না বলিয়াই তাকে মধুরতর রহস্যময়তর মনে হইতেছে।" [২৩]

বিমলের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখকএখানে আলোকপাত করেছেন। একদিকে প্রকৃতির প্রতি তার মোহ অন্যদিকে ফুল্লরার প্রতি বিবাহোত্তর জীবনের প্রেম ভাবনা এই দ্বৈত সত্তা বিমলের রহস্যের দ্যোতনা সংকেতময় করে তুলেছে।

প্রকৃতি কখনও আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনার দ্যোতনা সৃষ্টি করে থাকে। 'পদ্মা' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিনয় ও কঙ্কণের জীবনের বহু স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে তাদের মান অভিমান, মিলন বিরহ। বিনয়ের শিক্ষাসূত্রে কলকাতায় যাবার সংবাদ কঙ্কণকে বেদনাবিধুর করে তুলেছে এই দুঃসংবাদের পূর্বমুহূর্তে এক চিত্রধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন শিল্পী প্রমথনাথ ঃ

" পূর্ববনান্তের শিয়রে পূর্ণিমার প্রকান্ড চাঁদখানা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানুষের মনে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিতেই সমস্ত প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে ধূসর পৃথিবী স্বর্ণাভ হইল, তারকাহীন নভস্থল বিরাট দুই পাখা মেলিয়া বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল, নিকটে দূরের তরুশ্রেণী নানা অপ্রাকৃতিক মূর্তিগ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই যে বাতাসটি উঠিবে সেই তালে তালে কাঁপিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আর ক্ষুদ্র সেই জলাশয়টির চারিদিকের কিনারা বেষ্টন করিয়া সোনালী একখানা পাড়ের মত তকতক করিয়া

কাঁপিতে থাকিল।" [২৪]

এখানে 'পূর্ণিমার চাঁদ', 'স্বর্ণাভ পৃথিবী', 'সোনালী পাড়ের তক তক করে' প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ বেদনার সুরে লেখকের এই বর্ণনা তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে।

লেখক প্রকৃতি চিত্রণের মাধ্যমে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির বৈপরীত্য চিত্রণ কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

" তৃতীয়ার চাঁদের ক্ষীণ আলোতে ঘরের ছায়া উঠানে গাঁদা গাছের উপড়ে পড়িল, অদূরে লেবুফুলের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ বাতাস আসিতে লাগিল— আর দূর বনের কোকিলের গান লক্ষ যুগের বিরহ মিলনের স্মৃতির স্তর ভেদ করিয়া অক্ষয় তূণের অফুরন্ত সায়কের মত অবিরল ধারায় উভয়ের কানে পৌছিতে লাগিল।" [২৫]

বিনয় বহু প্রত্যাশা নিয়ে কঙ্কণের গৃহের আঙিনায় উপস্থিত। সে জানিয়েছে হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা। এদিকে লুপ্তশ্রী কঙ্কণ বিনয়ের সুদীর্ঘ উপেক্ষা সত্ত্বেও চির আকাঙ্ক্ষিতবিনয়কে এত কাছাকাছি পেয়েও প্রতীক্ষা করে বসেছে। তার বিকৃত চেহারা ও মুখমন্ডল দেখাতে সে অনিচ্ছুক। প্রমথনাথ সুদীর্ঘ বিরহের পর নায়ক নায়িকার সম্ভাব্য মিলনাকাঙ্ক্ষার এক প্রাকৃতিক পরিবেশ উপস্থাপিত করে তাদের অন্তঃপ্রকৃতির বৈপরীত্যকে অপরূপভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রকৃতি কখনও নিয়তিরূপে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়ে জীবন ও জগতের নিয়ন্ত্রক হয়েছে নদীর অন্তহীন জলধারার সঙ্গে। আবার নিসর্গ চেতনা ও মানবজীবন বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে জীবনকাহিনীর অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। 'পদ্মা' উপন্যাসে সর্বশেষ লাইন কটিতে কঙ্কণের মর্মান্তিক মৃত্যুতে লেখক পদ্মা প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন—

" পদ্মা মানুষের সুখ দুঃখের কোন সন্ধান করিল না, সে আপন মনে আপন সত্তায়

সঞ্জীবিত হইয়া বহিয়া চলিল। সে তো মানুষের নদী নয়, সে বিরাট কালনাগিনী প্রলয়ের সহোদরা।"[২৬]

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে রাজসাহী ও পাবনা জেলার প্রকৃতি কিভাবে এখানকার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে লেখক কবিত্বময় ভাষায় তার বর্ণনা করেছেন—

" প্রকৃতি ও মানুষ এখানে সহকর্মী। নিরীহ যাত্রীকে মানুষের বর্বরতাকে তাড়া করিয়া মারে, প্রকৃতির বর্বরতা তাকে পলায়নের পথে বাধা দেয়। মানুষ সুযোগ খোঁজে, প্রকৃতি রাত্রি আনিয়া দেয়। তাড়া করিবার জন্য মানুষ পাল তুলিয়া দেয়, প্রকৃতি তাহা ফুৎকারে ফুলাইয়া তোলে। মানুষ নৌকা লইয়া বসে, প্রকৃতি জলের স্রোত সঞ্চার করে। মানুষ খুন করে, প্রকৃতি অগাধ জলে সে মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। মানুষ ও প্রকৃতি জগাই ও মাধাই এর মত এখানে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বাস করিতেছে।" [২৭]

রাজসাহী ও পাবনা জেলার চলনবিলে প্রকৃতির মাটি ও জল বিশ্বাসঘাতক এখানকার মানুষেরা ডাকাতিবৃত্তি করে তাই এই বিলে বিনা মেঘে ঝড় ওঠে আবার বিনা ঝড়েই নৌকা ডুবে যায়। রাত্রিতে শতাধিক আলোর শিখা হাতে নিয়ে বজরায় কিংবা বড় নৌকায় চেপে শত শত মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট করে আদিম হিংস্রতার ইতিহাস রচনা করেছে।

আবার 'চলনবিলে' স্নিগ্ধ শান্ত কল্যাণময় রূপ ফুটে ওঠে ঋতুচক্রের আবর্তনে। শীতের কয়েক মাসের স্নিগ্ধরূপের বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে ঃ

" চলনবিল কুম্ভকর্ণের মত; ছয়মাস জাগিয়া থাকে, ছয়মাস ঘুমায়; শীতের কয়েকমাস তার নিদ্রা, বাকী কয়েকমাস তার জাগরণ। মানুষ লাঙ্গল লইয়া ধীরপদে বাহির হইয়া আসে,

গরু আনে বীজ আনে, দৈত্যের নিদ্রার সুযোগ লইয়া চাষ করিয়া ফসল বোনে। সরিষা, হলুদ, মশুর, ছোলা বাড়িতে থাকে, ফুল ধরে, ফসল পাকে, আবার মানুষে ব্যস্তপদে আসিয়া কাটিয়া লইয়া যায়, দৈত্যটা অকাতরে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে, কিছুই জানিতে পারে না।" [২৮]

দর্পনারায়ণের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পটভূমিকায় লেখক পদ্মা প্রকৃতির যে পেলব লাবণ্যময় বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে মানবচরিত্রের অপূর্ব যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে— বজরার ছাদে দর্পনারায়ণ ও বনমালা নবদম্পতির প্রাকৃতিক অনুভূতি কতটা কাব্যগুণ সমৃদ্ধ নিচের বর্ণনাটি তার দৃষ্টান্ত ঃ

" শীতের কুয়াশা তখনও নদীর উপরে ও দুই তীরে মধ্যের উপরে অতিসূক্ষ্ম মলমলের থানের মত বিলম্বিত; নদীর জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কলধ্বনিই তার অস্তিত্বের যেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুই পাশের তীরে কুয়াশার মলমল বিদীর্ণ করিবার জন্য সূর্যের ভূমিশায়ী রশ্মিরেখা চেষ্টা করিতেছে; আশেপাশের গাছপালার অস্পষ্ট আকার আলো ভীরু প্রেতাত্মার মত সঙ্কিতভাবে কাঁপিতেছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্পনারায়ণের সর্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জলকণায় আর্দ্র হইয়া গেল। সূর্যের কিরণ প্রখরতর হইয়া উঠিল; কুয়াশার মলমল অপসারিত হইতে হইতে দিগন্তের ধারে গিয়া ঠেকিল; দুই তীরে তীব্র পীতবর্ণ সরিষার ক্ষেত প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সরিষার ক্ষেতের মদির গন্ধে বাতাস মন্থর, বজরা ভাসিয়াই চলিয়াছে, দুই তীরের মধ্যে কখনও বা ছোলার কচি ক্ষেত, কখন কচি মুশুরের, কখন বা কচি আখের; শস্যের শ্যামলবর্ণ শিশিরের শুভ্র প্রলেপে ম্লানতর; নদীতে তরঙ্গ নাই; মাঠে লোকজন নাই; আকাশে মেঘ নাই, বাতাস যেন এখনো নিদ্রিত। সমস্তটা মিলিয়া দর্পনারায়ণের কাছে একটা স্বপ্ন জগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।" [২৯]

ঔপন্যাসিক আলঙ্কারিক প্রয়োজনে যখন প্রকৃতিচিত্র বর্ণনা করেন সেই প্রকৃতির সঙ্গে দর্পনারায়ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে ঃ

" তার তন্দ্রার মেহগনি ফ্রেমের মধ্যে বনমালার আর ইন্দ্রাণীর স্থলপদ্মের মতো কচি মুখ দুখানি দিব্য মাকুর মতো পর্যায়ক্রমে ছুটাছুটি করে স্মৃতির রেশমী বসন বুনতে থাকে। বন্যা যেমন সোনার পলি ফেলে রেখে এগিয়ে যায়— তেমনি বনমালা আর ইন্দ্রাণী কত সোনার স্মৃতি ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।"[৩০]

দর্পনারায়ণের অতীত স্মৃতির রোমন্থন করতে গিয়ে ইন্দ্রাণীকে না পাওয়া স্মৃতি আর বনমালাকে পেয়েও হারানোর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রাণী বিদ্যুৎশিখার দূরত্ব নিয়ে বনমালা ইন্দ্রধনুর দূরত্ব নিয়ে অবস্থান করছে তবুও তাদের স্থলপদ্মের মত মুখখানা সোনার পলির কতো সোনার স্মৃতি ঢেলে দিয়েছে।

বেণীরায়ের জাগ্রতা কালীমন্দিরের পাশে বাবলাগাছে মোহনকে বেঁধে রেখে কুশমিকে নিয়ে পরন্তপ এগিয়ে চলেছে লেখকের উপমা আশ্রিত বর্ণনাটি কতটা অনবদ্য—

" কেবল নিজস্ব রজনীতে বহুদূরাগত সেই ক্ষীণায়মান ছলাত ছলাত ধ্বনি অশ্রু বৈতরণীর করুণ মিনতির মতো তার কানে এসে বাজতে লাগল। সে নিস্ফল আক্রোশে সুরের মতো সেই ধ্বনির উদ্দিষ্ট পথের দিকে তাকিয়ে রইল।"[৩১]

এই উপমাটি মানবচরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অসহায় বালিকা কুশমিকে নিয়ে নৌকায় তোলা হলে জলের 'ছলাত ছলাত ধ্বনি' যেন অশ্রু বৈতরণীর করুণ মিনতির মতো তাকে ব্যঙ্গ করে চলেছে। এই চিত্রটিতে সুগভীর কারুণ্য প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব ও তার দ্বৈতরূপের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—

" কোন অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি আর মানুষের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, কি নিষ্ঠুর যে সংগ্রাম ! মাঝে মাঝে তাদের রণবিরতি ঘটে। তখন মানুষ আসিয়া প্রকৃতির কোলে বাসা বাঁধে, চাষ করিয়া ফসল ফলায়, প্রকৃতির দানে আঁচল ভরে, তখন মানুষের মুখে হাসি, প্রকৃতির মুখে

শান্তি ! দুজনেই ভাবে বুঝি এভাবে চলিবে। কিন্তু হঠাৎ রণবিরতির ভঙ্গ হয় ! তখন ভূমিকম্পে অট্টালিকা চূর্ণ, অগ্নুৎপাতে নগর ভস্মীভূত, জলপ্লাবনে জনপদ মগ্ন, ঝড়ে নৌবহর বানচাল, শস্যদাত্রী বর্ষা বন্যারূপে প্রাণহন্ত্রী, আর প্রকৃতি অবচেতন মনের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার মতো আকাশ ছাওয়া পঙ্গপাল পাকা ফসলের ক্ষেত্র লুটিয়া খাইয়া যায়, একটি কণাও অবশিষ্ট থাকে না। একই প্রকৃতির এই দুই বিচিত্র রূপ।" [৩২]

দর্পনারায়ণের চলনবিল এলাকায় নির্মিত বাঁধ বন্যার জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে দিয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বর্ষায় চলনবিল সমুদ্রাকার ধারণ করে পদ্মা আত্রেয়ীর বিপুল তরঙ্গিত জলরাশি খলখল হাসিতে কলকল কোলাহলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে লেখক প্রকৃতির খেয়ালীপনার বর্ণনাটি অনবদ্যভাবে তুলে ধরছেন।

মানব চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। হরিচরণের দলিল জাল, উপঢৌকন প্রেরণ, গোপন টাকা চলাচল ও সাক্ষী ভাঙানো প্রভৃতি অসৎ কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন ঃ

" হরিচরণ দাসের বিধাতা বিশ্বের যাবতীয় জন্তু জনোয়ারের রূপ ও গুণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে। মহিষের বর্ণ, হস্তির আয়তন, কোকিলের চক্ষু, সিন্দুঘোটকের গোঁফ , সর্পের কুটিলতা, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, কুকুরের স্বজন বিদ্বেষ, শিয়ালের ধূর্ততা, বিড়ালের তস্করবৃত্তি, পেচকের মুখশ্রী, বায়সের সতর্কতা, হংসের লোলুপতা, বৃশ্চিকের হুলবিন্ধন ক্ষমতা, সিংহের ক্রোধ, ভল্লুকের জড়তা যদি একত্র করা যায় এবং তাহার সহিত মানুষের অপরিমিত লোভ জুড়িয়া দেওয়া যায় তবে হরিচরণ দাসের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।" [৩৩]

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে লেখকের কবিত্বময়তা ও নিসর্গপ্রীতির অভাব নেই। তবে তুলনামূলকভাবে স্বাধীনতা উত্তরপর্বে প্রমথনাথের উপন্যাস প্রকৃতির ব্যবহারে অনেক

কমে গেছে। তবুও কিছু নিসর্গচিত্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

জন মিস এলমাকে হারিয়ে এলমার সমাধিতে প্রত্যহ ফুল দিয়ে মিস এলমার ভালবাসাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। রেশমী লাল ফুল নিয়ে নিবেদন করছে শ্রদ্ধার্ঘ্য। দুজনেই এলমার মৃত্যুতে শোকাহত, ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে এলমার আত্মার শান্তি কামনার পর লেখক প্রাকৃতিক পটভূমি রচনা করেছেন নিম্নোক্তভাবে ঃ

"ফাল্গুনের হাওয়ার দমক বড় বড় বনস্পতিগুলোর মধ্যে চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত হুহু করে ওঠে; নানা ফুলের মিশ্র গন্ধ ছড়িয়ে দেয় অব্যক্ত অস্পষ্ট আকুতি; হাজার তরঙ্গের চঞ্চল পাখা অদৃশ্যের উত্তরীয় প্রান্তের মত হঠাৎ গায়ে এসে ঠেকে আর অলক্ষ্যে ঘুঘুটা একটানা বিলাপের রশি নামিয়েই চলেছে অতলের তল সন্ধান করে।"[৩৪]

রেশমীকে ঘিরে জন স্বপ্ন দেখে প্রাকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন -

"রেশমী যখন ছাড়া পায়, ঝড়ে দোল খাওয়া বসন্তের পুষ্পবনের মত তার চেহারা। গাছতলায় বিন্যস্ত রঙ্গন, পলাশ, রক্তকবরী; বিতান পরিত্যক্ত মাধবীলতা ভূলুণ্ঠিত; পল্লবনিলীন পুষ্পস্তবক দস্যু হাওয়ার করক্ষেপে মর্দিত, পাণ্ডুকপোল চমুকদল ছিন্নভিন্ন, বনানীর পত্রলেখা অবলুপ্ত, বসনাঞ্চল বিবস্ত্র আর তার বক্ষের শিখরিণী ছন্দ তখন শার্দূল বিক্রীড়িতের উৎকট তালে সংস্পন্দিত।"[৩৫]

প্রকৃতি কখনও মৃত্যু চেতনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'লালকেল্লা' উপন্যাসে স্বরূপরাম প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জন এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা ভেবে কুন্তীতলাও এর স্নিগ্ধ জলে তুলসীর বিরহে আত্মবিসর্জনে উদ্যত হয়েছে তখন মাথার পরে 'পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা' বলে বারে বারে একপাখি হেকে যাচ্ছে লেখক স্বরূপরামের মানসিক অবস্থা প্রকৃতি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন —

" এমন সময়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে যে বিস্তৃত কুন্তীতলাও এর বারিতলে নিমজ্জমান চাঁদের ছায়া। চাঁদ ডুবছে, রাত গভীর। সেও কেননা অমনি তলিয়ে যায় জলতলে। কার কি ক্ষতি? এই উপলখন্ডগুলোর মতো একবার ক্ষণকালের জন্য টোপ উঠবে - তারপরেই ব্যস্, সমস্ত অবসিত।"[৩৬]

শিল্প উপকরণ হিসেবে প্রকৃতি বর্ণনাটি দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের প্রকৃতিচেতনা রোমান্টিক স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টির সহায়ক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক উপকরণের রূপ রং আভাসিত হয়ে দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে এরূপ একটি প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনাঃ

" তুলসী দেখতে পায় একটি ধবধবে সাদা রঙের রাজহাঁস - তার দেহ যেন মানস সরোবরের ফেনা জমিয়ে তৈরী, তার ঠোঁটে লাল রঙের একটি স্ফুটোনোন্মুখ পদ্মের কুঁড়ি, সে রকম গাঢ় কোমল রঙ কোথাও দেখেনি আগে, ও রঙ যেন রতির প্রসাধনের কুঙ্কুম পেটিকা থেকে নেওয়া সেই রাজহংস সেই লাল পদ্মের কুঁড়িটি নিয়ে তার চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে।"

এখানে 'ধবধবে সাদা রঙ এর রাজহাঁস, 'ঠোঁটের রং লাল পদ্মের কুঁড়ির মত' ইত্যাদি বর্ণনায় রূপ ও রং এর সঙ্গে উপমাটি অনবদ্য হয়েছে।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে নিসর্গের স্থান খুবই কম একমাত্র উপমাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে নিসর্গচেতনার ব্যবহার হয়েছে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত ঃ

" কালকে অতুল এক ফাঁকে রুক্মিণীর মুখ দেখেছিল রাহুগ্রস্থ চন্দ্রমা, আর আজ একি, অপস্রিত ছায়া শরৎ পূর্ণিমার শশী।"[৩৭]

শচীনের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হবার আগে রুক্মিণীর মুখ ছিল বিষন্ন 'রাহুগ্রস্থ চন্দ্রমা'র মতো আবার বিবাহ স্থির হবার পর রুক্মিণীকে শরৎ পূর্ণিমার শশীর মতো দেখাচ্ছে

লেখকের চাঁদের উপমাটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির দর্শন করতে গিয়েছিল শচীন, রুক্মিণী, মলিনা, রমণী। গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে পৌঁছাতেই গঙ্গা তীরবর্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যটি লেখক কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন -

" জোয়ারের কলকল, স্নিগ্ধ বাতাস, এপারে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার, ওপারে সূর্যাস্তের শেষ আভা, নদীর জলে নৌকার আলো, মন্দিরের শঙ্খ ঘন্টার রব সমস্ত মিলে মায়াজাল নিক্ষেপ করলো তাদের মনের উপর।"[৩৮]

আলোচ্য অংশে সন্ধ্যা প্রকৃতির পটভূমি গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। প্রকৃতি চিত্রটি এখানে গভীর ভাবে দ্যোতক।

'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন লেখক ঃ

" লব প্রনাম করলে, গান্ধী তাঁর দোভাষী আর টাইপিস্টকে নিয়ে একখানা ডিঙি নৌকায় চড়লেন, কচুরি পানার চাপ ঠেলে লগির জোরে নৌকা চল্‌ল — যতক্ষণ দেখা গেল সেই দিকে তাকিয়ে রইল লব, অবশেষে সন্ধ্যার ঘোরে আর কুয়াশায় মিলিয়ে গেল সেই দৃশ্য।"[৩৯]

লেখকের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথের নিসর্গচেতনা গাঢ় সংবেদন ফুটে উঠেছে বিভিন্ন উপন্যাসে। কখনও পটভূমিরূপে কখনও মানবচরিত্রের সঙ্গে, কখনও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে, কখনও প্রকৃতির রুদ্র ও মধুর রূপ প্রকাশে প্রমথনাথের নিসর্গ ভাবনা স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসের ভাষাশৈলী

" সাহিত্য রচয়িতার আত্মপ্রকাশের মূল আশ্রয় ভাষা। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হয় যে কেবলমাত্র ভাষার কারুকার্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ভাবের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্যকেই বলে সাহিত্যের আর্ট।" [৪০]

প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনরীতি এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কাব্যগুণের অনুসারী হলেও রচনাশৈলীর দিক থেকে প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্যতা আছে প্রমথনাথের সাহিত্য পাঠক মাত্রই একথা জানেন।

" পৃথিবীর সব ভাষারই নিজস্ব একটি রূপ থাকে; শক্তিমান ভাষা শিল্পী সেই আদর্শ থেকে সরে এসে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভাষার নতুন ক্রম শুরু করেন, ভাষায় ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখেন। কিভাবে কতটা সরে আসবেন, সে স্বাধীনতা শিল্পীর 'পছন্দে'র উপর নির্ভর করে।"

লেখকের পছন্দের উপর নির্ভর করে লেখক বিশেষের রচনার ধরণ পরিবর্তিত হয়। রচনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যই এক একজন লেখকের স্টাইল এক এক রকমের।

লেখক শব্দের পর শব্দ নিয়ে বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে গড়ে তোলেন স্মৃতির সৌধ, গড়ে ওঠে ভাবের সঙ্গে একাত্মতা, শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার সহযোগে আভাসিত হয় চিত্রকল্প, গীতিব্যঞ্জনা। ভাষার মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেশিল্পীর জীবনদৃষ্টি, আপন ব্যক্তিত্বের ভাবনায় গড়ে ওঠে অজস্র চরিত্র; চিন্তায় অনুভবে ও প্রকাশ ভঙ্গির অভিনবত্বে চরিত্রগুলো সজীব হয়ে ওঠে। কথাশিল্পীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। তবে প্রকাশরীতি কখনও বিষয়কে অতিক্রম করবে না উভয়ের মধ্যে মেলবন্ধনই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের লক্ষণ।

ঔপন্যাসিকের নিজস্ব শৈলী প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে —

এক।। ব্যাখ্যা, বিবৃতি।

দুই।। চরিত্রের সংলাপ (সাধারণ কথাবার্তায় ও নাটকীয় সংলাপে)

এই দুই এর সুষম প্রয়োগেই শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপিত হয়। শিল্পী পাঠকমনে 'ল্যান্ডস্কেপ' ফুটিয়ে তোলেন ভাষার মাধ্যমে।

কল্লোল ও কল্লোলোত্তর বাংলা গদ্য সাহিত্য শৈলীর স্বাতন্ত্রতার দাবী রাখে। ভাষা যেমন বহতা নদীর মত পরিবর্তনশীল ঠিক তেমনি লেখকের ভাষাভঙ্গিও পরিবর্তনশীল। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র যে ষ্টাইল 'চতুরঙ্গ' 'শেষের কবিতা'য় ষ্টাইল রীতির পার্থক্য চোখে পড়ে। বাংলা কথা সাহিত্যে অন্যান্য শিল্পীদের মতো প্রমথনাথের একটা নিজস্ব রীতি বা ষ্টাইল আছে যাকে প্রমথীয় ষ্টাইল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রমথনাথের প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলো রচনার ক্ষেত্রে যে ধরনের ষ্টাইলে লিখেছেন বিশেষ করে 'দেশের শত্রু', 'কোপবতী', 'পদ্মা' 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' স্বাধীনতা উত্তরকালের উপন্যাসগুলিতে বিশেষত 'কেরী সাহেবের মুন্সী' 'লালকেল্লা', 'বঙ্গভঙ্গ', 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের ষ্টাইলের পরিবর্তন ঘটেছে। নিম্নে প্রমথনাথের উপন্যাসগুলির বাণীভঙ্গির নানা বৈশিষ্ট্যের আলোকে লেখকের ভাষাশৈলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল ঃ

প্রমথনাথের ভাষাশৈলীর দর্পণে যে বিষয়টি সর্বপ্রথমে আলোচিত তা হল বর্ণনাধর্মী ও বিবৃতি নির্ভর ভাষা ও সংলাপের ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের ব্যবহার।

'দেশের শত্রু' উপন্যাসে বর্ণনা অংশে ও সংলাপের অংশের ক্রিয়াপদ সাধু। সাধুরীতির সংলাপের সাহায্যেই ঔপন্যাসিক বিভিন্ন চরিত্রের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। সাধুগদ্য লেখা বক্তব্যের ভাষা ঃ

'' বন্ধুগণ বল তোমরা কি ইংরাজী ভাষা পড়িতে চাও ? আর্য্য হইয়া অনার্য্যের ভাষা,

হিন্দু হইয়া ম্লেচ্ছের ভাষা কেন? তোমাদের কি দেবভাষা সেই সংস্কৃত নাই? যে ভাষায় ভাস - ভবভূতি, কালিদাস বীনানিদান করিতেন, যে ভাষায় ব্যাস বাল্মীকি কাব্য লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন - যে ভাষার গুণ শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয় - নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয় - হৃদয় পবিত্র হয় - সে ভাষা কি তোমাদের নাই।"[৪১]

এখানে 'করিতেন', 'হইয়া', 'গিয়াছেন', 'লিখিয়া', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সাধু। প্রমথনাথ সাধু গদ্য ভাষার আবেগময়তা সৃষ্টি করেছেন।

'কোপবতী' উপন্যাসের সংলাপ অংশ চলিত ভাষা বর্ণনা অংশের ভাষা সাধুরীতির ঃ

" ফুল্লরা উঠিয়া আসিয়া রুমাল দিয়া কষিয়া বিমলের চোখ বাঁধিয়া দিল।

- দেখতে পাচ্ছেন?

বিমল বলিল পাচ্ছি।

- কাকে?

আপনাকে ? আপনি হাসছেন।

ফুল্লরা হাসিল বটে !

- কি সর্বনাশ।"[৪২]

'পদ্মা' উপন্যাসের সংলাপ ও বর্ণনা অংশের ভাষারীতি 'কোপবতী'র মতই।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' ও 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের সংলাপে চলিত ভাষা বর্ণনা অংশে সাধুরীতির ব্যবহার হলেও 'চলনবিল' উপন্যাসটির ভাষারীতি অনেকটা অভিনব। এখানে বর্ণনারীতিতে সাধুভাষা ও চলিত ভাষা দুটোরই সুষম প্রয়োগ ঘটেছে। আবার সংলাপ অংশের ভাষা চলিত। ক্রিয়াপদগুলি কোথাও সাধু কোথাও চলিত। যেমন বর্ণনা অংশঃ

" বাতাসপড়া বিকেলবেলার আকাশে ঝাউগাছগুলো শ্মশানের চিতার ঊর্ধ্বোত্থিত

ধূমরাশির মতো স্তব্ধ; একটা পাপিয়া চোখ গেল চোখ গেল আর্তনাদ করতে করতে বিষম যন্ত্রণার বেগে আকাশের একদিক থেকে আর এক দিকে ছুটে চলে গেল।" [৪৩]

পাশাপাশি 'চলনবিল' উপন্যাসের বর্ণনা অংশে সাধুরীতির ব্যবহার

" প্রথম হইতেই পরন্তপ মেয়েটিকে বিষচক্ষে দেখিল, আবার সেই সূত্রে চাঁপার সহিত প্রকাশ্য সঙ্কট দেখা দিতে আরম্ভ করিল। পরন্তপ সুজানিকে কখনো কোলে লইত না, কখনো কাছে ডাকিত না; বরঞ্চ সর্বদাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া অনাদর প্রকাশ করিত।" [৪৪]

'কেরী সাহেবের মুন্সী' 'লালকেল্লা' 'বঙ্গভঙ্গ' 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের বর্ণনা অংশ ও সংলাপ অংশ দুটোতেই চলিত রীতির প্রয়োগ করেছেন লেখক। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের বর্ণনা অংশের চলিত গদ্যরীতি -

" ওরে রাখ্ রাখ্, বলে চীৎকার করে উঠল বসুজা। মেয়েটি প্রাণভয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। সকলে মিলে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠেলেঠুলে চিতায় উঠিয়ে দিল। চিতা থেকে নামানোর উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রামবসু। সকলে মিলে তাকে নিবারিত করল। কতক আগুনের ঝলকানিতে, কতক মানুষের ঠেলাঠেলিতে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকল সে গঙ্গাতীরে।"[৪৫]

'লালকেল্লা'র বর্ণনা অংশে চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার ঃ

" জীবন দেখে যে তুলসীর চোখ জ্বলছে, কপোল তপ্ত হয়ে উঠেছে, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে, উন্মুক্ত ওষ্ঠাধর অধিকতর রক্তিম হয়ে উঠেছে, বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে।"[৪৬]

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের বর্ণনা অংশে চলিত ভাষার ব্যবহার ঃ

" দিল্লীর জল হাওয়া ভালো, খাদ্যখানা সস্তা, চারিদিকে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান; আবার হে মাতঃ বঙ্গকে ছেড়ে যেতে হবে, এখানকার যে সব পথঘাট দৃশ্যাবলী অতি পরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে ম্লানভাবে বিরাজ করছিল হঠাৎ তারা মনের শিরা উপশিরায় উপরে

মোচড় দিতে শুরু করেছে।"[৪৭]

"পনেরোই আগষ্ট" উপন্যাসের চলিত্রীতির সংলাপ ঃ

" বাবা।

কি মা?

আজতো সারাদিন কিছু খেলে না!

আজ যে অনশন।

সে তো সকলের হয়ে গান্ধীজী করছেন।

তাঁর সহযোগিতা করতে হবে না?

আচ্ছা বাবা, দেশ স্বাধীন হল এত আনন্দের ব্যাপার, তবে আবার অনশনে কেন?"[৪৮]

প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলোর সংলাপ অংশে ছোট ছোট বাক্য থাকলেও বড়ধরণের আবেগধর্মী সংলাপের প্রয়োগ করেছেন লেখক। কিন্তু স্বাধীনতাউত্তর উপন্যাসের সংলাপ অংশ অর্থাৎ চরিত্রের কথাবার্তায় বাক্য সংখ্যা খুবই সংক্ষিপ্ত।

সম্বোধনরীতি বাংলা ভাষার অন্যতম বিশিষ্ট কলাকৌশল। প্রমথনাথ তার উপন্যাসে সম্বোধন রীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সামাজিক সম্পর্কীয়রা কিংবা লেখক কখন কখন পাঠকদের উদ্দেশ্য করে সম্বন্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে সামাজিক মর্যাদা, অনাত্মীয়তা, বয়সের অসমতা, স্নেহপ্রবণতা, অচ্ছিল্য সর্ব কিছুই প্রকাশিত হয়েছে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ।

প্রমথনাথ উপন্যাসে বঙ্কিমী রীতিতে পাঠকদের উদ্দেশ্যে জীবনজিজ্ঞাসা ব্যক্ত করেছেন ঃ

(ক) " পাঠক ভুল করিও না। বিমল আদৌ মেয়েটির প্রতি আসক্ত নয়, বাস্তবে তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আদৌ তাহার নাই।" [৪৯]

(খ) " পাঠক হয়তো ভাবিতেছেন, লেখকের অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা এখন কথা বলিয়া নারীর ক্রোধের লক্ষ্য হইবে কেন ?"[৫০]

(গ) "পাঠক তুমি ভাবিতেছ - এ কি হইল ! তোমার গল্পপাঠের আগ্রহের পারদ দেখিতে দেখিতে নামিয়া একেবারে নৈরাশ্যের কোঠায় গিয়া ঠেকিয়াছে।"[৫১]

(ঘ) " পাঠক আমাদের কাহিনীর পটভূমি উপরিউক্ত কাল। উক্তকালে যাহা সম্ভব, তার বেশি আমার গল্পে আশা করিও না। বালিগঞ্জ বিলাসীদের কথা ইহাতে নাই।"[৫২]

লেখক পাঠকদের উদ্দেশ্য করে কাহিনীর পূর্বাভাস কিংবা মূল্যবান সমালোচনা করেছেন সম্বোধন রীতির আশ্রয় নিয়ে।

প্রকৃতি প্রেমিক বিমল কলকাতা থেকে ফিরে যত্নে লালিত গাছপালার খবর নিয়েছে মিতনের কাছ থেকে। মিতনকে সম্বোধন করে -

" কিরে ? গাছপালা সব আছে না খেয়ে ফেলেছিল ?

- শুধু গাছ পালা কি হবে দাদাবাবু ! তুমি বাড়ি আস না"

— এখানে কিরে, তুমি সম্বোধনরীতিতে একদিকে স্নেহপ্রবণতা অপরদিকে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়েছে।

ফুল্লরা বিমলকে সম্বোধন করেছে -

'আপনি বসুন'

বিমল ফুল্লরাকে সম্বোধন করেছে

'রাত বেশি হয় নি বসুন।'

ফুল্লরা ও বিমল বিবাহের পর পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে।

অনাত্মীয় যুবতী রমণী কঙ্কণ প্রথমে বিনয়কে 'আপনিসুদ্ধ' পরে তুমি বলে সম্বোধন

করেছে।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে উদয়নারায়ণ দর্পনারায়ণকে পদ্মাবক্ষে বজরায় গর্জন করে বলেছে -

" হতচ্ছাড়া ভবঘুরে তোর যেখানে খুসী যা! আমি তোর মুখ দেখতে চাইনে, তোকে বাড়িতেও ঢুকতে দেব না।"

আবার বনমালাকে উদ্দেশ্য করে -

" দিদি আমি আজই তোমাকে নিয়ে রওনা হব।"

এখানে বাৎসল্যভাব প্রাধান্য পেয়েছে 'তোর' ও 'তোমাকে' সম্বোধন করে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে টুশকীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে যে রেশমী অন্য কেউ নয় তারই বোন সেই মুহূর্তে সম্বোধন ঃ

" ওরে রেশমী, রেশমী এতকাল কেন সৌরভী নাম নিয়ে আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি, কেন বলিসনি তুই আমার আপন বোন, তুই রেশমী।"

রেশমীর সঙ্গে টুশকির রক্তের সম্পর্ক জানবার পর 'তুমি' থেকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেছে।

ছোট, মাঝারি ও বড় নানান দৈর্ঘ্যের বাক্য এবং যতি চিহ্নের সুষম ব্যবহার প্রমথনাথের ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে বিভিন্ন মাপের বাক্য ব্যবহার করেছেন যাতে ভাষার গতি, ছন্দ ও সঙ্গীতটি পাঠকচিত্তে বিশেষভাবে সাড়া জাগাতে পেরেছে—

ছোট বাক্যঃ

(ক) 'ভালই করেছ।' (লালকেল্লা)

(খ) 'অদ্ভুত এই লোকটি - আমার ভারি আশ্চর্য লাগে? (কোপবতী)

(গ) 'কতকাতা শহর যেন লক্ষ্মীছাড়া চেহারা।' (পনেরোই আগষ্ট)

(ঘ) 'তখন দুই জন দুই ভিন্ন পথ অবলম্বন করে।' (কেরী সাহেবের মুন্সী)

(ঙ)' সেদিন রক্তদহের অধিকাংশ ঘরেই সন্ধ্যাবাতি জ্বলিল না।'

(জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার)

প্রমথনাথ যেমন এরূপ ছোটখাটো বাক্য সংলাপ অংশে কিংবা বর্ণনা অংশে ব্যবহার করেছেন ঠিক তেমনি মাঝারি বাক্যের ব্যবহার করেছেন যথাযথভাবে —

(ক) " তখন তার মনে পড়ে প্রশস্ত গড়ানে কপালে লিপ্ত আছে প্রাতঃকালের সন্ধ্যাহ্নিকের চন্দনের ছাপ, সেই কপালের নীচে কাঁচা পাকা ভুরুর তলায় জ্বলন্ত টিকার মত দুটি চোখ, জ্ঞানের একটুখানি হাওয়া লাগতেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে - আর দুই চোখের মাঝখানে বিন্ধ্যপর্বতের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মস্ত এক শুষ্কনাশা।" [৫৩]

ঔপন্যাসিক দীর্ঘবাক্যেরও প্রয়োগ করেছেন সুষমভাবে যা পাঠকমনে বিরূপতা সৃষ্টি করে নি বরং গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, দৃষ্টান্তঃ

" আজ আর এই দুটির মধ্যে সে ভেদ করিতে পারিল না। যে সত্য মিথ্যাকে দূরে রাখিয়া আপনার পরিত্রতাকে বাঁচায় - তাহাও সত্য নহে কারণ সে মিথ্যাকে ভয় পায় - যে বিরাট সত্যমিথ্যা দেবদৈত্য জীবনমৃত্যু স্বর্গমর্ত্ত এবং আকাশের তারা ও পৃথিবীর দ্বীপকে আপনার মধ্যে সুষমা সমন্বয় করিয়া মহত্তম - আজ খেলা করিতে বাহির হইয়া - বিনয় তাহাকে দেখিয়া ফেলিল, অতি অতর্কিতে অত্যন্ত বিনা সাধনায় এ খেলার স্মৃতি চিরন্তন হউক, পরিবর্তনকে সে ভয় করেনা - যখনই রাত্রির চন্দ্রতারা খচিত অন্ধকারের মণিমঞ্জুষাটি খুলিবে তখনি সে দেখিতে পাইবে, বিরাটের এই আর্তি অমূল্য স্বাক্ষর করা অঙ্গুরীটি এবং তাহার গাত্রে

তাহার এই নৌযাত্রার বন্ধুদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং বন্ধন, সখ্য এবং সৌহার্দ্য; মানুষের তুচ্ছতা সেখানে প্রবেশ করেনা, কালের সিঁধকাঠি যেখানে পৌঁছিতে পারে না - মহাকাল স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার মণিহারের মধ্যমণিটি করিয়া গাঁথিয়া লন।"[৫৪]

উদ্ধৃতিটি 'পদ্মা' উপন্যাসের 'চরচিলমারী পুনর্বার' অংশের একাদশ পরিচ্ছেদ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘবাক্যটির পূর্ণচ্ছেদ এসেছে ১০ লাইন পরে। বাক্যটিতে আমরা লক্ষ্য করি ৭ টি কমা এবং একটি সেমিকোলন, গতিপ্রবাহ বোধক চিহ্ন বা ড্যাস ৬টি, 'ও' মাত্র একটি 'এবং' মোট পাঁচটি। মনে করা যেতে পারে সেমিকোলন, কমা গতিপ্রবাহবোধক চিহ্ন, 'ও' ,'এবং' ব্যবহার না করে লেখক পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে এই সুদীর্ঘ একটি বাক্যকে একাধিক বাক্যে বিভক্ত করতে পারতেন। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য তা ছিল না। এক তীব্র আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা নেই বিশেষ পরিস্থিতির অর্থাৎ পদ্মাবক্ষে নৌকাভিযানে বিনয়ের মনকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে তুলেছে এবং নিজের মনের মধ্যে এমন নিঃশব্দ রাত্রিতে কঙ্কণের সঙ্গে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সাক্ষাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান। আলোচ্য অংশে দীর্ঘ মানসাভিসারের ভাবটি ভাষায় যথাযথ ভাবে ধরে রাখার জন্যই প্রমথনাথ এক দীর্ঘায়িত বাক্যের আশ্রয় নিয়েছেন। একাধিক চিহ্নের ক্ষণিক বিরতিতে, তার ভাবতরঙ্গ যেন ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে পরবর্তী চিন্তার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আকস্মিক বিরামচিহ্ন আসেনি।

শুধু বাক্য গঠনই নয় - এর অর্থবহ মাত্রাও বর্তমান। বাক্যটিতে সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে ১৭ টি। এই সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার বক্তব্যের ভিতকে আরো শক্তিশালী করেছে এখানে দীর্ঘ বর্ণনার নেপথ্যে রয়েছে বিনয়ের ভাবোচ্ছ্বাস।

বাক্যের নির্মাণ পদ্ধতিতে বাক্যটি ছোট হবে না বড় হবে এধরণের কোন লিখিত রীতি উপন্যাস তত্ত্বে নেই। সেটা ঔপন্যাসিকের পছন্দের উপর নির্ভর করে। তবে বড় ধরণের

বাক্যের পাশে ছোট ধরণের বাক্য ভাষার গতিশীলতা দান করে। এজন্য লেখক ছোট মাঝারি ও বড় বাক্য ব্যবহার করে ভাষার ছন্দ ও সঙ্গীত প্রবাহকে ধরে রাখেন জাত শিল্পী। এই শিল্পগুণে ভাষা পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টি করে। জাতশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে এরূপ ছন্দ ও সঙ্গীত প্রবাহ পাঠকমনে আবেদন সৃষ্টিকরতে পেরেছে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে ভাষা জগতের বৃহত্তর ব্যাপ্তি বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। তিনি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কথ্য ভাষা থেকে শুরু করে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আঞ্চলিক, নারীর মুখের ভাষা, বাদশাহী আমলের উর্দু, আরবী, ফারসী, হিন্দী, ইংরেজী, পুরাণ, ইতিহাসের জগৎ সর্বত্রই লেখনী স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহৃত করেছেন।

ঔপন্যাসিক তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিভিন্ন উপন্যাস থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিঃ

তৎসম শব্দ ঃ শ্রদ্ধা, অনন্তকালের নক্ষত্রদল, অশ্রুপ্লাবিত, বীনানিনাদ, কৃষ্ণকায়, দেশমাতৃকা, জ্যোৎস্নাচিক্কণ, বামপয়োধর, জ্যোৎস্নার অমৃতচন্দলেপ, শ্বেতকল্লার শতদলে, জোতির্ময়, নীলাম্বরী, জ্যোতিষ্কজাল, শুভ্র স্নিগ্ধ হস্তাবলেপন, ইন্দ্রধনু, কুমুদিনী, পুষ্প, পত্র, প্রশ্ন, পিতা, সন্ধ্যা, ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দঃ মাটি, ঘরটিকে, কাঠের, উঁচু, বুড়া, পুঁথি, কাঁচা, কাঁটা, মাথা, মাঝে, সাপ, চাঁদ, বাছা, মাঝে, চোখের, কাঁদিত ইত্যাদি।

দেশী শব্দ ঃ স্থানে স্থানে তৎসম শব্দের পাশে লেখক দেশী শব্দেরও সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন যেমন - ঝাপসা, ঝড়, ডাঁসা, গাড়ি, ঘোড়া, ঢাল, ঢেউ, কুড়ি, সড়কি, খোঁপা, অমল ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দ ঃ নোঙর, নভেল, নবাব, আদালত, শয়তানী, খেলনা, বন্দুক, সিন্দুক,

তোপ, বিবি, বোতল, গীর্জা, পাদরী, নীলাম, হাসপাতাল, মাতৃভূমি, পাদপ্রদীপ ইত্যাদি।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত। মূল শব্দটির পূর্বে কিংবা অব্যহতির পরে বিশেষণ সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন - শিশির ভেজা ঘাস, সুপক্ক কালো জাম, মিশমিশে কালো, অচপল শুভ্রতা, নিঃশব্দ হাস্য, কৃপাকরুণ ওষ্ঠাধর, স্নিগ্ধ তরুতল, প্রোজ্জ্বল দিগন্ত, অকালশরতের সৌন্দর্য, অপরিমেয় গভীরতা, অশরীরী নারীমূর্তি, প্রভাতের জাগরণ, শেওলা ধরা পাথর, শ্বেতপাথরের কারুশোভী সম্রাটের আসন ইত্যাদি।

নতুন শব্দ গঠনের প্রয়াসে শিল্পসুশোভন রসসৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। যে শব্দগুলির ব্যবহার ও শব্দের গঠন বৈচিত্র্য নবসৃষ্টির মর্যাদা ও ভাষার প্রসারতা দান করেছে। যেমন -

সুর্যাস্তের ভরাডুবি, উড়োঠাকুর, ছেড়াছাড়া, নৈশদিগন্তের স্নেহবিহীন অন্ধকার জীবন, নিরপেক্ষ ছাত্রবাৎসল্য, খিঁচাইয়া, ফুসফুস ফাটা চীৎকার, মোহাচ্ছন্ন ঘৃণার, দোহাত্তা, অন্ধিসন্ধি, বেপর্দা, মামদোবাজি, আনন্দসম্ভোগ, সত্যপুরুষ, প্রহরীর চ্যালেঞ্জের ভাজে ভাজে প্রভৃতি।

প্রমথনাথের উপন্যাসের ভাষার সমাস ব্যবহারে দুটি রূপ দেখা যায়। সমাসবদ্ধ পদ ও ব্যাসবাক্য দু ধরণের সমাসের রূপকে লেখক ব্যবহার করেছেন। সমাসবদ্ধ পদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

প্রমাণকন্টকশূণ্য, স্বপ্নশিল্পী, দীপালোকিত, অঙ্গবাহিনী, তন্দ্রাবিভূত , জয়োল্লাস, জীবনউত্তরণ, মনিমঞ্জুষা, অনাবৃষ্টি, ভক্তিস্রোত, সৃষ্টিছাড়া, সুপ্তোত্থিত, দিগ্বধূগণ, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি।

ব্যাসবাক্য যুক্ত শব্দেরও অভাব নেই -

সন্ধ্যাআরতি, সমুদ্রের তরঙ্গ, পদ্মের কুঁড়ি, দন্তের আভাস, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, বসন্তের পুষ্পবন, ঈর্ষার আগুন, নদীর কল্লোল, প্রকৃতির মায়া প্রভৃতি।

প্রমথনাথ উপন্যাসে কিছু কিছু সমার্থক শব্দের ব্যবহার করেছেন যেমন - লজ্জাসরম, বন্ধুবান্ধব, হাটবাজার, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি।

আবার বিপরীত শব্দের ব্যবহার করেছেন - যেমন সত্যমিথ্যা, কল্পনাবাস্তব, অনুমান প্রমাণ, জন্মমৃত্যু, ন্যায় অন্যায়, ছেলে বুড়ো, হাসিকান্না, গুরু শিষ্য, আলো আঁধার প্রভৃতি।

কথাসাহিত্যে ধ্বনি গৌরবের জন্য ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। ধ্বনি গৌরবযুক্ত অনুকার ও ভাবপ্রকাশ ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রমথনাথ বিশী উপন্যাসে উল্লেখ করে শিল্পসুষমার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক সচেতনভাবেই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে গভীর, সূক্ষ্ম ও অনুভূতিপ্রধান ভাবকে প্রকাশ করেছেন এরূপ কয়েকটি উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিঃ

" নৃত্যগোপালবাবুর দুই পারে ঘুঙুর গুনগুন করে বন্‌বন্‌ করে পাক খেতে লাগল।" (দেশের শত্রু)

এখানে গুন্‌গুন্‌ বন্‌বন্‌ শব্দদ্বয় ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

'কোপবতী' উপন্যাসে সার্থক ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগঃ

" জল খলখল করিয়া উঠিল।"

" লকেটটি চক্‌চক্‌ করিতেছিল।"

" মিশকি জামের মত কুচকুচে কালো এবং গোল একটা পাথর দিল।"

- এখাপে খলখল, চক্‌চক্‌, কুচ্‌কুচে শব্দত্রয় স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করেছে এবং এগুলো কোন প্রতিশব্দ নেই।

'পদ্মা' উপন্যাসের ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ঃ

" কোথায় কি যেন একটা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিধিত লাগিল।"

" শিশির পাতা হইতে টপটপ করিয়া শিশির ফোঁটা জলে পড়িয়া টোপ তুলিতে লাগিল।"

" ওপারে বর্ষার জলে থাক কাটা তীরের তলে রৌদ্রমুক্ত নীলাভা ছায়াখানিতে ছলচল করিতে লাগিল।"

" দীর্ঘ ছিপছিপে পাতলা গড়ন, ছিলা ছেঁড়া ধনুকের যষ্ঠির মত সরল।"

- এখানে খচখচ, টপটপ, ছলছল, ছিপছিপ, প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিরল নয়। যেমন -

ঠক্‌ঠক্‌, রীরী, হুঁহুঁ, দাউদাউ, কড়কড় ইত্যাদি ।

'চলনবিল' উপন্যাসে —

" রোদে চকচক করে।"

" তাদের ঘাস ছেঁড়বার তালে তালে উত্থিত মুচমুচ শব্দ।"

" একরাশ ফুল ঝরঝর, ঝুরঝুর করে পড়ে।"

" অবিশ্রাম বাতাসের টানে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে, আর জলে উঠছে ছপাত ছপাত ছলাত ছলাত শব্দ।"

— এখানে চকচক, মুচমুচ, ঝরঝর, ঝুরঝুর, টিপটিপ, ছপাত ছপাত, ছলাত ছলাত শব্দগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা' ও 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দ — ঘরঘর, হো হো, মর মর, গটগট, খটখট, কড়কড়, ঢাকঢাক, গুরগুর, খুঁটে খুঁটে ইত্যাদি।

প্রমথনাথ উপন্যাসে অব্যয় ব্যবহার করেও ভাষার সৌরভকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

নিষেধাত্মক অব্যয় 'না' 'নাই' প্রভৃতি ব্যবহারে ভাষার ঐশ্বর্য্যকে লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন - এরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি ঃ

(ক) " তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, না, না, যে নাগপাশে সে আজ কয়েক বছর হইল জড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই তাহা হইতে মুক্তি নাই, মুক্তি নাই। (কোপবতী ১৬ শ অনুচ্ছেদ)

(খ) " চারিদিকে অনন্ত বালুরাশি - যাহাতে মানুষের চিহ্নটুকুও নাই - আকাশেও না - জলতলেও না — এখানে কেবল আদিম প্রকৃতি।"(পদ্মা - চরচিলমারী পুনর্বার ১১ শ অধ্যায়)

(গ) " না না এই রূপ লইয়া আজ সে বিনয়ের সম্মুখে বাহির হইতে পারিবে না। " (পদ্মা - চরচিলমারী পুনর্বার ১১ শ অধ্যায়)

(ঘ) " আমার শত্রু নাই , মিত্র নাই, আত্মীয় নাই, পর নাই, আমার দ্বেষ নাই, প্রেম নাই, আমি পাষাণ। পাষাণের মত নিঃসঙ্গ, নির্জন, নির্জীব, নিস্তব্দ, বাসনার অতীত সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে , আমার প্রাণ নাই, কাজেই মৃত্যু নাই; আমার ভাল-মন্দ, সৎ অসৎ কিছু নাই, আমার ন্যায় নাই, অন্যায় নাই; সত্য নাই মিথ্যা নাই, আমি মানুষ নই। "[৫৫]

(ঘ) তুলসী বলে, না।

জীবন বলে যাওয়ার সময় না বলতে নেই, বলো হ্যাঁ। তুলসীর মুখ দিয়ে হ্যাঁ বের হতে গিয়ে আবার বের হয় না।" [৫৬]

প্রথম দুটি বর্ণনা অংশে 'না' 'নাই'এর ব্যবহার ও পরবর্তী তিনটি সংলাপ অংশের অব্যয়ের ব্যবহার লেখকের ভাষা নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সরল বাস্তবধর্মী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিক এরূপ বাস্তবজীবন ধর্মী ভাষা প্রয়োগ করে উপন্যাসকে তাৎপর্যপূর্ণ করে

তুলেছেন যেমন ঃ

" ফুল্লরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল - আমাকে বিয়ে করে তুমি বোধ হয় ভুল করেছ।

বিমল শুধাইল - কেন ?

- কেন কি ? আমি অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে, তুমি শিক্ষিত , সারাজীবন শহরে মানুষ, আমি তোমার মনের মত নই।

বিমল বলিল - এ তোমার মনের ভুল ফুল্ল।" [৫৭]

বাস্তবধর্মী ভাষার মাধ্যমে লেখক নায়ক নায়িকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন যা উপন্যাসের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ।

প্রমথনাথের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণের পরিচয় বিভিন্ন উপন্যাসে সার্থকভাবে বিধৃত হয়েছে। 'পনেরোই আগষ্ট' থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

" অরবিন্দ ছাদে উঠে দেখল আগুন জ্বলছে, উত্তরে পূর্বে দক্ষিণে জ্বলছে বাড়িগুলো, বন্দুকের আওয়াজ, আর আল্লাহো আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

ছাদের রেলিঙের উপর ভর দিয়ে অরবিন্দ ভাবছিল এ, কোন্ যুগে বাস করছে, একি ইংরেজ আমল না নাদিরশাহী আমল, একি বিংশ শতাব্দী না কোন বর্বর যুগ, একি হিন্দুস্থানের চিতা, না পাকিস্তানের কটাহ। একি স্বাধীনতার পূর্বস্বাদ না পরাধীনতার শেষ ভস্ম!" [৫৮]

লেখক সরল প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ করে কলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের বর্বরোচিত অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে রামরাম বসুর মৃত্যুর পর আমাদের দৃষ্টি দর্পণে ভেসে ওঠে সৌরকরোজ্জ্বল প্রাকৃতিক চিত্র ঃ

" প্রভাত হল। পরম শোকের পরদিবসেও সূর্য তেমনি উজ্জ্বল, বাতাস তেমনি মধুর,

আকাশ তেমনি নির্মল। আশ্চর্য এই জীবন! আশ্চর্য এই পৃথিবী!" [৫৯]

প্রমথনাথের মনোধর্ম অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন চিত্রকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে। জাত শিল্পীর এটি উল্লেখযোগ্য গুণ। লেখকের উপন্যাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

(ক) " কেবল রহিয়া রহিয়া পদ্মার দ্বিগুণিত কলধ্বনির মধ্যে ছেদ টানিয়া দেয় পাড় ভাঙার কামান গর্জন।" (পদ্মা)

— এখানে 'কামান গর্জন' শব্দে যুদ্ধের উন্মত্ততার চিত্রকল্প সূচিত হয়েছে।

(খ) " সে ফুলিয়া, কাঁদিয়া, ফুসিয়া গর্জিয়া, আকাশের গায়ে লেজ আছড়াইয়া, পৃথিবীর উপরে ছোবল মারিয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে দেহ পাকাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।"[৬০]

— এখানে ফুসিয়া ছোবল মারিয়া সাপের চিত্রকল্পের প্রতীক জন্মায়।

(গ) " রেশমী, রেশমী - রেশমী - ঐ নামের অন্তিম উচ্চারণে জীবনের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা করুণা, মাধুর্য নিঃশেষ করে দিয়ে এক ফুৎকারে নির্বাপিত হয়ে গেল দীপ।" (কেরী সাহেবের মুন্সী)

— নির্বাপিত দীপ এখানে মৃত্যুর চিত্রকল্প দ্যোতনা করে।

(ঘ) " তাই যখন দুজনের রক্তিম অধরোষ্ঠ থেকে রক্তাভ দাড়িম্বদানার মত চুম্বন স্খলিত হয়ে চলেছে তখন নড়ে উঠল শিকল বাইরের শিকল।" (লালকেল্লা)

এখানে 'শিকল নড়ে উঠল' এই শব্দত্রয়ের ব্যবহারে তুলসী ও জীবনলালের চুম্বন মুহূর্তে পান্নার আগমনের চিত্রকল্প ভেসে ওঠে।

সাহিত্যে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের রীতি আছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকরা আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। বিশেষ করে আঞ্চলিক উপন্যাসে

অঞ্চল বিশেষের স্থানীয় উপভাষা সাহিত্য সৃষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান যা উপন্যাসের রসোপলব্ধিতে পাঠকের কোন বিঘ্ন ঘটে না। প্রমথনাথ বিশী রাজসাহী ও পাবনার আঞ্চলিক ভাষাকে স্থানে স্থানে ব্যবহার করে উপন্যাসকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। তবে প্রমথনাথের সমগ্র উপন্যাসে উপভাষার ব্যবহার খুবই কম। তবুও দু একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসে রাজসাহী জেলার উপভাষা ভাগচাষী করিমের মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন —

" আমি কি কাঁদতে কইচি, একবার গিয়া দেইখ্যা আইসেন, সে হইব না।"

'লালকেল্লা' উপন্যাসে যশোহরের ভাষা দুএকস্থানে প্রয়োগ করেছেন। তুলসীকে অপহরণ করবার পর ভুতিবুড়ির মুখ থেকে যশোরেব উপভাষা শোনা যায় —

" তুমি নাই, কর্ত্তাবাবু নাই দেখবে কেডা তারে।

তা কেমন করি জানব!

অনেক রাত হয়েছে শোও য়্যানে বাবা।"

এত রাতে আবার কনে চললে?"

যশোহর জেলায় ছিল ভুতিবুড়ীর আদি নিবাস। অদৃষ্টের হাতে ঘুরতে ঘুরতে অনেক কাল দিল্লীতে এসে পড়েছে তবু তার কথায় যশুরে টান সম্পূর্ণ যায় নি। নয়ন যখন বলেছিল - এতকাল দিল্লীতে থেকেও যশুরে টান গেল না বুড়ীর। তখন বুড়ীর আঞ্চলিক সংলাপ -

" যশুরে টান কি বেঁচি থাকতে যাবে, ও যে আমার শ্বশুর বাড়ির দেশ।"

তুমি তো আমার নাকটা মুখের মধ্যি পুরি দিয়ে কামড়াতে।"

'কোপবতী' উপন্যাসে বীরভূমের উপভাষা বিমলের বিশ্বস্ত ভৃত্য মিতনের মুখে শোনা যায়—

" ও হবেক নি দাদাবাবু এলে বলবেক কি।

আজ আর আসবেক কেন।

কে গো বটেক। পোদ্দার মশাই ? ও হবেকনি।

বুধবার আসবেক।

এবারে শিকিধানও পাইনি, আমাকে জব্দ করবার জন্য ও বলবেক। আমি ও কে দেখে লিব।

মাঝে এখনো দুটো দিন আছেক কি বল্ ?''

কথাশিল্পী প্রমথনাথ আলোচ্য উপন্যাসে বলবেক, সবারে, লিব, দিলেক, দিবেক, আসবেক, হবেকনি, আছেক, বললেক, আনলেক ইত্যাদি উপভাষা ব্যবহার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

'কোপবতী' উপন্যাসে দু একটি চরিত্রের মুখে সাঁওতাল পল্লীর সাঁওতালী ভাষার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় । যেমন - 'দেল্লা হুজমে'। বীরভূমের সাঁওতালী ভাষাকে সাহিত্যে মর্যাদা দিয়ে স্থানীয় ভাষার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন লেখক প্রমথনাথ।

লেখক মালদহ জেলার আঞ্চলিক ভাষাা চন্ডীবক্সীর মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন -

'' এখনও ধর্ম আছে রে, এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে, মা গঙ্গা মর্ত্যে আছেন, তাই জানিয়ে রাখছি, ম্লেচ্ছের সাধ্য নেই তোকে বাঁচায়। আজকের মত রক্ষা পেলি বলেই চিরকালের মত রক্ষা পেলি তা ভাবিস নে রেশমী, তা ভাবিস নে!'' [৬১]

ইংরেজের মুখে উচ্চারিত ইংরেজী উচ্চারণ ঘেঁষা আধা বাংলা ভাষার ব্যবহার করেছেন লেখক। কথাশিল্পী উপন্যাসে বাস্তবতা আনতে গিয়ে যে চরিত্রের মুখে যে ভাষা উপযুক্ত তার সংলাপে সে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন ইংরেজ সাহেবের মুখে আমরা খাঁটি বাংলা ভাষার উচ্চারণ প্রত্যাশা করতে পারি না। লেখক তার উপযোগী ভাষা যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ' উপন্যাসে নাটোরের কালেক্টর মিঃ বার্ড এর মুখের ভাষা ঃ

"টুমি বিউনোপার্টের নাম শুনিয়াছ?

আমি টাকে জয় করিয়েসি।"

লেখক 'লালকেল্লা' উপন্যাসে ইংরেজী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কোম্পানীর ইংরেজ সৈনিক রুমালীকে দেখে - "Here a fine specimen. Beaty.

This is not fair Bob. I am following her for a pretty long time!

But I am in possession of her. Don't you know that possession is the esence of right.

Right! Absolutely wrong, you Cad! Indeed."[৬২]

লেখক চরিত্রানুগ ভাষা প্রয়োগে উপন্যাস শিল্পের উৎকর্ষতা বাড়িয়ে তুলেছেন সন্দেহ নেই।

ইংরেজের মুখে উচ্চারিত বাংলা ভাষা 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে ম্যাজিস্ট্রেট ক্লোজেট সাহেবের মুখ থেকে শোনা যায়ঃ

"মানুষের মস্টক খাইটে সাড়ু না আছে।

আর টাহা ছাড়া বাইবেলে নিষেড আছে।"[৬৩]

আসলে ইংরেজের মুখে খাঁটি বাংলা ভাষা প্রত্যাশা করলে উপন্যাসের রসহানি ঘটতে পারে ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ এব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

'দেশের শত্রু' উপন্যাসে একজন সহিসের মুখের ভাষাঃ

" ছভাপতি মছায় আমি ইংরেজি না পড়েই এত বড় হয়ছি।"

উপমা প্রয়োগের ফলে সাহিত্যে প্রসাদগুণ এনে দেয়। ঔপন্যাসিকের একটা মহৎগুণ উপমার বৈচিত্র্য, সাদৃশ্য আবিষ্কারের অভিনবত্ব, কল্পনা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি। প্রমথনাথ বিশীর

উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমার সংখ্যা কম নয়। গুণগত উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে উপমাগুলো উপন্যাসের মূল্যবান সম্পদ। তবে উপন্যাসে উপমার বাহুল্য অনেকক্ষেত্রে দুর্বলতার লক্ষণ বলে মন্তব্য করেনে অনেকে। উপমা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন —

" যুক্তির দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই উপমার সৃষ্টি।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন —

" উপমা অল্পবুদ্ধির লক্ষণ। অশিক্ষিত এবং শিশুরা এটা করে থাকে। "

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক ঔপন্যাসিকরা সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে উপমাকে ব্যবহার করেছেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য উপমার প্রয়োগ করে থাকেন ঔপন্যাসিকরা ঃ

(১) পরিস্থিতি চিত্রণ।

(২) চরিত্র স্ফূটন।

(৩) চরিত্রের স্বরূপ।

(৪) মনস্তত্ত্ব নির্ভর উপমা।

(৫) লোকজীবনাশ্রয়ী উপমা।

(৬) পুরাণাশ্রিত উপমা।

প্রমথনাথ বিশী সার্থকভাবে উপমার প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন উপন্যাসে। তাঁর নিসর্গাশ্রিত উপমা, প্রাণী বাচক উপমা, বস্তুবাচক উপমা ব্যবহার করে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের বহু উপমায় সূক্ষ্ম কবিত্বের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। দৃষ্টান্তলো প্রদত্ত হল ঃ

" বাহিরে তখন তৃতীয়ার চাঁদের আলো, লেবু ফুলের গন্ধ, আর বহুযুগের বহু সুখদুঃখের নির্যাসের মত ওই কোকিলের কুহুস্বর !ঘরের মধ্যে সেই আয়না খানা চাঁদের আলোয় এক বিন্দু

অশ্রুর মত নিরপেক্ষ বিধাতার চক্ষুতে ছলছল করিতে লাগিল।"('পদ্মা' দ্বাদশ অধ্যায়)

বিনয় কঙ্কণের দ্বার থেকে চলে যাবার পর কঙ্কণের মানসিক অবস্থা বোঝাতে লেখকের আলোচ্য উপমাটির অবতারণা। পরিস্থিতি চিত্রণে উপমাটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কঙ্কণের বেদনাবিধুরতা লেখক 'সুখদুঃখের নির্যাসের মত' 'একবিন্দু অশ্রু র মত' কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরেছেন উপমাটিকে।

" পলাশে, শিমূলে আর গুলমোরে রঙের মাতামাতি লাগিয়া গিয়াছে - শত শত পিচকারীতে লাল রঙের পাগলামি - বৃন্দাবনের কোন বনে শ্যামবসনধারী রাখাল বালকেরা যেন হোলিতে মাতিয়াছে। "

'কোপবতী' উপন্যাসের উপমা অলঙ্কারটি চেয়ে দেখবার মতো।

চরিত্রের স্বরূপচিত্রণে উপমার দৃষ্টান্ত —

" যেন সুগন্ধ ধূপদানী হইতে সুধাসৌগন্ধে কোন্ অলক্ষ্য দেবতার বন্দনার মত উত্থিত হইতেছে; সমস্ত দেহখানি যেন অলৌকিক একগাছা মন্দার মালার ন্যায় কোন্ দেবতার পদপ্রান্তে লুটাইতেছে। (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার)

— 'দেবতার বন্দনার মত' 'মন্দার মালার ন্যায়' উপমাদুটি বনমালার চরিত্রের স্বরূপ চিত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে।

পুরাণাশ্রিত উপমা প্রমথনাথ বিশী উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে মহাভারতের প্রসঙ্গ উপমার গৌরব লাভ করেছে —

" ঘন অন্ধকারে দিগ্বধুর পর্যাপ্ত কেশরাশির মত মুহ্যমান, রজত রেখায় তার অর্ধসুপ্ত হাসিটি নলের রাজহংসের মত বৃহৎ চন্দ্র স্থাগিত পক্ষে ধীরে ধীরে দময়ন্তীর প্রাসাদে বাটিকায় আরোহণ করিতেছে; পৃথিবীতে আর সব অন্ধকার।"

বনমালাকে এখানে দিগ্বধূর পর্যন্ত কেশরাশি এবং নলের রাজহংসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের উপমা —

"মনের কোণে জেগে থাকে অন্ধকার আকাশের কোনে শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার মত তার মধুর হাসিটুকু।" - দেবতার চরণে নিবেদিত প্রাণ রেশমীর উৎসারিত ভক্তির আবহ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের এই উপমাটি সার্থক ঃ

"সেদিনকার সেই ব্যর্থ চুম্বন নলের হংসদূতের মত শুভ্র তপ্ত কোমল পক্ষপুটে আচ্ছন্ন পরে, শষ্প মৃদু গ্রীবাটি রাখে রেশমীর গ্রীবায়।"

— অতীত স্মৃতি রোমন্থনের ব্যাপারে রেশমীর মানসিক অবস্থা বর্ণনায় লেখকের উপমাটি হৃদয়গ্রাহী।

'লালকেল্লা' উপন্যাসের উপমা —

"স্বেচ্ছায় কখনো ধরা দেবেনা সেই সাক্ষী সবলে তাকে ছিনিয়ে নিতে হবে, মত্ত হস্তিনী যেমন সমূলে ছিন্ন করে নেয় সরোবরের সনাল মৃনাল পদ্মকে।"

লেখক রুমালীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আলোকপাত করেছেন অনবদ্য ভাবে। সে জীবনলালকে মত্ত হস্তিনীর মত মৃণাল পদ্মকে ছিন্ন করে নেবার প্রয়াসী।

নিম্নোক্ত উপমাটি লোকজীবনাশ্রিত —

" সুখ আসে একা একা চোরের মত, আর দুঃখ আসে ঝাঁক বেঁধে ডাকাতের মতো।"

লেখক সুখ ও দুঃখকে লোকজীবনাশ্রিত উপমার সাহায্যে তুলে ধরেছেন।

নিম্নোক্ত উপমাটিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত —

" প্রতিষ্ঠানের পতন হলেও কিছুক্ষণ বজায় থাকে ঠাট, সদ্য মৃতের দেহে জীবনের

তাপের মতো।" শেষ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত —

" ঘউস মহম্মদ কুলি খাঁকে বলেছে - আমরা কি নাবালক নাকি?

না, বালক! - বলে ওঠে কুলি খাঁ।"

এখানে না, বালক = নাবালক শ্লেষ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

সূক্ষ্ম শ্লেষ অলঙ্কার —

' সেরের চেয়ে মনের ওজন অনেক বেশি।'

অনুপ্রাস অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ —

" ঐ তারায় তারায় মন্দিরা, বাজছে, জ্যোৎস্নার রসুনচৌকি থেকে সুর ছাপিয়ে পড়ে পূর্ণ করে দিচ্ছে আকাশকে, আর দিগন্তের নীবীবন্ধ খুলে ফেলে দিয়ে নৃত্যরতা ঐ নক্তটিনী, স্খলিত, অঞ্চল পূর্ণচন্দ্রে যার বাম পয়োধর, রুমালীর রক্ততরঙ্গে যার নূপুরের রুম ঝুম, ঝুম ঝুম, রুমালীর ধমনীতে ধ্বনিত যার কঙ্কণ - কিঙ্কিণী কেয়ূর - কাঞ্চীর শিঞ্জিত রিণ রিণ ঝিন ঝিন।"

— এখানে 'নৃত্যরতা' 'নক্তনটিনী' ধমনীতে ধ্বনিত, কঙ্কণ-কিঙ্কিণী -কেয়ূর - কাঞ্চী অনুপ্রাস অলঙ্কার। আলোচ্য ছত্রকটিতে অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাশিল্পী প্রমথনাথ উপন্যাসে অসংখ্য বাগ্ ধারা ও প্রবাদ ব্যবহার করে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন যেমন -

'অশুভস্য কাল হরণ', 'কাকস্য পরিবেদনা', 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ', 'মানিক জোড়', 'দিল্লিকা লাড্ডু', 'অদ্যভক্ষ ধনুর্গূণঃ', 'কালনেমির লঙ্কাভাগ', 'জোর যার মুলুক তার', 'চোরের উপর বাটপারি', 'কচি পাঠা বৃদ্ধ মেষ', ' চাচা আপন বাঁচা', 'দুর্বলের অস্ত্র

মিথ্যা', 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী', 'বিপদে মধুসূদন', 'বামুন গেল ঘর লাঙল তুলে ধর','বাঘে ছুলে আঠারো ঘা', 'নামে কাজ করে বয়সে কি আসে যায়', 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া', 'ভীমরুল সাত হাত জলের তলায় গিয়ে কামড়ায়', 'মানলে কেউটে না মানলে ঢোঁড়া' প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে স্থানে স্থানে মন্তব্যের গভীরতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্য উপন্যাসকে অনন্যতা দান করেছে। যে বাক্যগুলি চিরন্তন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত গভীর চিন্তাশীল মন্তব্যের সংমিশ্রণে ও ভাষা প্রয়োগের অদ্ভূত নিপুণতায় তিনি বিচিত্র। তাঁর জীবন সমীক্ষা ও স্থানে স্থানে তীক্ষ্ম মনীষার অভিব্যক্তি উপন্যাসকে গৌরবপূর্ণ করে তুলেছে। যেমন —

"ইংরেজীতে আছে সুন্দরী স্ত্রীলোক, ভালো বই ও তাম্রকূটের পরে নদীর মত এমন সুন্দর সঙ্গী নাকি আর নাই।"(পদ্মা)

"আগু দর্শনধারী পাছু গুণবিচারী।" (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার)

"ইস্কুলে যারা পেছনের সারির ছাত্র, জীবনে তারাই প্রথম শ্রেণীর লোক কারণ বিদ্যালয় বস্তুটা জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়া প্রতিষ্ঠিত।"

" সুখী মানুষ শিশু চিরসুখী মানুষ চিরশিশু।" (কেরী সাহেবের মুন্সী)

"সংসারে মোটালোককেই সকলে সহজে বিশ্বাস করে, ওদের ভরা পেট কিনা, ঠকিয়ে নেবার প্রয়োজন কম।"

" শয়তানে শয়তানে বুদ্ধিতে মিল, দেবতায় দেবতায় গরমিল। তাইতো দেবতা কখনও পেরে ওঠে না শয়তানের সঙ্গে।"

" রূপের চেয়ে গুণের মূল্য অনেক বেশি।"

" নারী সৌন্দর্য্যের দাস, পুরুষ সৌন্দর্য্যের ক্রীতদাস।" (লালকেল্লা)

প্রমথনাথের উপন্যাসে এরূপ অজস্র পান্ডিত্যপূর্ণ প্রবাদ বাক্যের মত চিরকালীন মর্যাদা দান করেছে।

সবজাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে। নারীদের ভাষায় শ্বাসাঘাত ও স্বরাঘাত একটা বিশেষ লক্ষণ। বাংলা শব্দভান্ডারের পুরনো শব্দ বেশি ব্যবহার করে নারীরা। তবে নিম্নশ্রেণীর নারীদের ভাষায় সংযমের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা লজ্জাশীলা হলেও নিজেদের কথা বলার সময় ওদের জিহ্বায় অনেক কিছু আটকায় না। যেমন - 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে রামবসু ও অন্নদার সংলাপ অংশটিতে নারীদের মুখের ভাষার ধরণ সুস্পষ্ট ঃ

" অন্নদা তর্জন করে শুধাল, বলি ওটা কি?

রামবসু হেসে বলল, খুলেই দেখ।

অন্নদা কাগজের মোড়ক খুলে দেখল, আলখাল্লার মত একটা বস্তু।

আমাকে বুঝি সঙ সাজাবার জন্য এনেছ?

শেমিজ কখনও চোখে দেখেনি সে।

না গো না, এসব মেম সাহেবেরা পরে, ঘাস সাহেবী দোকান থেকে খরিদ।

তখন সেটা ফেলে দিয়ে গর্জন করে উঠল, ওরে ড্যাকরা মিন্সে, নিজে খিরিস্তান হয়ে সাধ মেটে নি, এখন আমাকে খিরিস্তান করার মতলব। থুঃ থুঃ। তখনই সে গঙ্গাজল স্পর্শ করে পবিত্র হল।"

এখানে বসুপত্নী অন্নদার মুখের ভাষা পুরুষদের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র।

আর একটি উদাহরণ তুলে ধরছিঃ

তুলসীর প্রতি রুমালীর উক্তি ঃ

"নিমকহারাম আর কাকে বলে, আমি দু দুবার রক্ষা না করলে এতদিনে শাহজাহানাবাদের পাতে পড়ে কাবাব হয়ে যেতিস। এত দাপট থাকতো কোথায় ?"

এছাড়া তুলসী ভুতিবুড়ির কথোপকথনে, ডাকুরায় ও ক্ষেন্তবুড়ির কথোপকথনে, টুশকি ও রেশমীর সংলাপে নারীদের ভাষার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। নারীর বিশেষ বাকভঙ্গি, শব্দপ্রয়োগ প্রমথনাথ অত্যন্ত সযত্নে চরিত্রগুলির সংলাপ অংশে ব্যবহার করেছেন।

লেখক উপন্যাসে 'শালা' ও 'মাগী' এই দুটি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তা চরিত্রে অসঙ্গতির সৃষ্টি করেনি। যেমন —"মর মাগী" (লালকেল্লা)

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে তিনু চক্কবর্ত্তী ও চন্ডীবক্সীর লড়াই কালে —

' তবে রে শালা' বলে চন্ডীবক্সী তিনুর ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আবার জন ও রেশমীর কথোপকথনে শালা শব্দের অর্থ জন বুঝতে পারে নি লেখক বর্ণনা করেছেন - "শালা!"

জন বলল, নো নো, বাংলা শব্দটা অনেক বেশি মিষ্টি, সা - লা।"

Sa - La!

— এখানে এই শব্দটি প্রয়োগে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

এছাড়া 'কোপবতী' উপন্যাসে মিতনের মুখে একাধিকবার 'শালার গরু' এই শব্দদ্বয় আমরা শুনতে পাই। লেখক চরিত্র উপযোগী এরূপ অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করলেও তা রসহানির ঘটে নি।

প্রমথনাথের উপন্যাসে হিন্দী সংলাপ ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মুখে।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের বক্তা টহলরাম গঙ্গারামের হিন্দীর সঙ্গে বাংলা ও প্রয়োজনে দু চারটে ইংরেজী মেশানো ভাষা মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে -

" মারো লাথ হবে কাৎ আসর মাত । বঙাল কে আদমিকা ঐ এক দোষ, ভাবে কবিৎ করলেই কাম হাসিল হবে। আরে ইয়ার ঐ শালার দেশে সেক্সপীয়ার নামে একটা লোক কবিৎ কিরেছে, পারবে তার সঙ্গে কবিৎ করতে, তবে! ও পথ ছোড়ো। বানিয়া শালোকো বেসাতি সে মারো চোট - তব শালালোগ **Will beg for mercy** ! "

'লালকেল্লা' উপন্যাসে হিন্দী সংলাপ ঃ

" বহিন বহু তিয়াস।

তিয়াস স্রিফ পানিসে মিটেঙ্গী জী ?"

এরূপ হিন্দী ভাষাদের উপন্যাসে স্থান দিয়ে ভাষাগত ব্যাপ্তিকে বাড়িয়ে তুলেছেন শিল্পী প্রমথনাথ।

লৌকিক উপাদান

প্রমথনাথের উপন্যাসের গজল, মীরার ভজন, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে সংগৃহীত শ্লোক, ছড়া গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই উপকরণগুলি লোকজীবনাশ্রিত এবং চিরকালের জন্য আবেদন সৃষ্টি করেছে।

বাদশা বাহাদুর শাহের লেখা গজলটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে ঃ

"কুছ ঢিল ই রূম নাহি কিয়া

ইয়া শা - হি - রূষ নেহিন

যো কুছ কিয়া না সরে সে,

সো কিয়া কারতুস নে" -

অর্থাৎ একধারে ইতিহাস কাব্য ও ভবিষ্যৎবাণী এই গজলটি। যা রোমের বাদশা কিংবা রুশের শা পারেনি। সে কাজ কার্তুজেই করেছে।

'লালকেল্লা' উপন্যাসে মীরার ভজনগুলি উপন্যাসকে তাৎপর্যমন্ডিত করেছে -

" জল বিন কবল চন্দ্ বিন রজনী।

ঐ সে তুম দেখা দিন সজনী।"

হোলি পরবের গান -

" যমুনা কি তীরে গাও চরাওয়ে

মিধা তান শুনাওয়ে।"

রামপ্রসাদী গান -

" আয় মা সাধন সমরে,

দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের সংকেত বাক্যটি —

" দামড়া ফলে আমরা গাছে

আমরা বলি না

কৎলু খাঁয়ের কাটবো গলা

কোথায় পাবো দা।"

মহাভারেতের শ্লোকঃ

অকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।

গোবিন্দ! দ্বারকাবাসিন্। কৃষ্ণ গোপীজন প্রিয়।" প্রভৃতি।

এছাড়াও কিছু কিংবদন্তী রামজানি সম্প্রদায়ের উদ্ভব, বেণীরায়ের ডাকাতকালীর মন্দিরের

নরবলিদানের প্রথা ইত্যাদি উপন্যাসে এধরনের ছড়া, গান, গজল, মহাভারতের শ্লোক, কিংবদন্তীর মানবিক আবেদন চিরকালের যা উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নাট্যগুণ

কথাশিল্পী প্রমথনাথের উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নাট্যগুণের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে কেননা নাট্যগুণ উপন্যাসের একটি অবাঞ্ছিত উপাদান। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নাট্যগুণের অভাব নেই। তবে ঘটনা প্রধান উপন্যাসে নাট্যগুণের প্রাধান্য বেশি আবার চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে নাট্যগুণের সমাবেশ অনেকটা কম। তবে উপন্যাস নাটক নয় কাজেই প্রতিটি উপন্যাসে নাট্যগুণ থাকবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাহিনীর ঘনঘটা বৈচিত্র্যময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ নাট্যগুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন সচেতন শিল্পীর মতই। 'দেশের শত্রু' উপন্যাস থেকে শুরু করে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাস ধারায় নাটকীয়তার স্পর্শ তার কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্র নির্মিতিতে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও প্রকাশভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক নাট্যরস চিত্রণের জন্য দ্বন্দ্ব চিত্রণ ছাড়া ও হৃদয়গত উৎকণ্ঠা, ঘটনাগতির চরম মুহূর্ত ও পটভূমি পর্যালোচনা, নাটকীয় চমক, নাটকীয় আকস্মিকতা উপন্যাসকে শৈল্পিক তাৎপর্য ভাস্বর করে তুলেছেন।

উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে স্নেহ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত বিরোধ, নায়ক নায়িকার প্রণয়াকুতি নাটকীয় রসতাৎপর্য দান করেছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় শ্রেণীর উপন্যাসেই নাটকীয়তা থাকলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও নাট্যগুণ সমৃদ্ধ।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে নাটকীয় চমক কতটা সার্থকতা অর্জন করেছে

উদয়নারায়ণের সংলাপেই তা সুস্পষ্ট ঃ

'' উদয়নারায়ণ গর্জন করিয়া উঠিল - তবে রে হতভাগা তুই! ভবঘুরের মত ঘুরে মর্‌বি - মর। এই চাষাদের মধ্যে এসে চাষাদের মধ্যে থাকবি থাক - তা বলে আমার নাতবৌকে গরীবের মত রাখার তোর কি অধিকার ?''

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে রেশমীর বহ্নুৎসবের সময় জনের আর্তি নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে।

লালকেল্লায় তোপের মুখ থেকে জীবনলালের মুক্তি নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করছে। আবার জীবনলালের প্রতি রুমালীর দুর্নিবার প্রণয়াকুতি নাট্যদ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত।

'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে সুশীলের মৃত্যু নাটকীয় আকস্মিকতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বিমলের কোপাইগর্ভে সলিল সমাধি, কঙ্কণের পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া রেশমীর মৃত্যু ঘটনা নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। প্রমথীয় কথাসাহিত্যে নানা পরিস্থিতির মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা চরম মুহূর্ত ও চরম মুহূর্তের অনিবার্য পতন সৃষ্টি করে নাট্যরস শৈল্পিক তাৎপর্যে ভাস্বর হয়েছে সন্দেহ নেই।

জীবনদর্শন

লেখকের ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় জীবনদর্শনের মাধ্যমে। উপন্যাসে জীবন বীক্ষা তাই আমাদের অতি প্রত্যাশিত। জীবনব্যাখ্যাহীন কথাসাহিত্য আর যাই হোক না কেন তা বিশিষ্ট শিল্পবোধের পরিপন্থী। লেখকের কলমে জীবনের বৈচিত্র্যময় ছবি বাস্তবতার প্রাণরসে উজ্জিবিত হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা বিশ্লেষণে মানবজীবনের জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটিত

করেন। ভাষার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তার জীবন সম্পর্কের ভাবনাগুলি ব্যঞ্জিতকরে তোলেন। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সমন্বয়সাধন করে ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনভাবনা উপন্যাসে ব্যক্ত করেন। ঔপন্যাসিক তার জীবনদর্শনকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন দুটি উপায়ে ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে মানবহৃদয়কে তুলে ধরে এবং মানবহৃদয়ের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করে। একদিকে বস্তুবাদী চিন্তা অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তত্ত্বভাবনা প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে লেখকের কোন জীবনদর্শন লুকিয়ে আছে সহৃদয়সংবাদী পাঠকের কাছে তার অনুসন্ধান হল মুখ্য বিষয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা, প্রেম, মৃত্যু, ভাষা সবকিছুতেই লেখকের জীবনবিষয়ক বক্তব্য প্রকাশিত হয়। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয় মুখ্য গৌণ প্রত্যেকটি চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে লেখকের ভাবনা প্রকাশ লাভ করে কিছু কিছু বিষয় আপাত অশ্লীল বলে মনে হলেও লেখকের বিস্তৃত জীবনভাবনায় তা সাহিত্যপদ বাচ্য হয়ে ওঠে।

" উপন্যাসে জীবন বিন্যাস ঔপন্যাসিকের মানস বিধৃত লেখকের জীবনানুভূতির মাধ্যমে উচ্চারিত হয় জীবন জিজ্ঞাসা। আর এর মধ্যেই উপন্যাসের শিল্পগৌরব নিহিত। গূঢ় জীবন জিজ্ঞাসা উচ্চারিত না হলে কোন উপন্যাসই মহৎ মহিমা লাভ করে না।"[৬৪]

একজন ঔপন্যাসিক মানবজীবনের ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত। মানবজীবনের দার্শনিকের মতো তিনি শিল্পের মাধ্যমে চেতনার প্রতিফলন ঘটান জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে।

" ঔপন্যাসিক যখন লেখেন, তখন তিনি যে শুধু সাধারণভাবে একটি আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক মানুষ রচনা করেন তা নয়, তিনি আপন সত্তারই একটি অন্তর্নিহিত ভাষ্য রচনা করেন।"[৬৫]

উপন্যাসের মূল্যবোধ জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে। উপন্যাসিক সমকাল ও ভাবীকালকেপ্রত্যক্ষ করেন মূল্যবোধের দর্পণে। ঔপন্যাসিক সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করে সমাজের ত্রুটিপূর্ণ দিক তুলে ধরেন, আবিষ্কার করেন সত্যের নগ্নমূর্তি। অত্যাচার, অনাচারের চিত্র তুলে

ধরতে গিয়ে লেখককে হয়তো কোন একটি পক্ষকে সমর্থন করতে হয় স্বাভাবিকভাবে। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই গড়ে ওঠে জীবনবোধ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে—

" নিত্য নব সমস্যার আবির্ভাবের সঙ্গে নুতনতর প্রতিভার উন্মেষ, শক্তির প্রকাশ, সমস্যায় আর শক্তিতে সংগ্রাম, সমস্যার প্রতিভূ - প্রকৃতির পরাজয় আর শক্তির প্রতিভূ মানুষের জয়,— এই হলো মানুষের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস।"[৬৬]

ঔপন্যাসিক জীবনদর্শনের মাধ্যমে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেন সূক্ষ্ম কথাকৌশলের সাহায্যে। কথাসাহিত্যে তাই কালাতীত সত্য, কালের সত্য ও ভাবীকালের সত্য চিরন্তন সত্যে রূপান্তরিত হয় লেখকের নিপুণ তুলির স্পর্শে।

Henry Fielding, Middleton Murry, Abrams, Baffons প্রভৃতি বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন উপস্থাপন কৌশলের মাধ্যমে লেখক তার সমগ্র জীবনবোধের পরিচয় তুলে ধরেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের সুরদাসবাবুর কথা। লেখকের নিজের কথা, বিমলের প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ লেখকের প্রকৃতি প্রেমের নিদর্শন। বিমলের আত্মযন্ত্রণা, প্রেম ও বিবাহোত্তর জীবনের সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন, বিনয়ের অসংযত আচরণ তার জীবনে করুণ পরিণতি বয়ে এনেছে, এ ভাবনা লেখকের গভীর জীবনবোধের পরিচয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শৌর্য বীরত্ব কালের দ্বন্দ্বে বিলুপ্তি ঘটেছে উদয় নারায়ণের জীবনের শেষ পর্যায়ের ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার অদম্য প্রয়াস লেখকের মননশীলতার পরিচয়। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্তে ' সমাজ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। 'চলনবিল' উপন্যাসে দর্পনারায়ণের কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলবার প্রয়াস লেখকের কলমে কালের দ্বন্দ্ব

প্রকাশিত হয়েছে। 'লালকেল্লা'য় জীবনলালের দৃষ্টিতে কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক। ঐতিহ্যবাহী একটা যুগের আবির্ভাব উত্থান পতনের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন গভীর জীবনবোধের সঙ্গে। বাদ্‌শা বাহাদুর শাহের চোখে কিভাবে ইতিহাস পাল্টে যাচ্ছে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার ইঙ্গিত তুলে ধরেছেন লেখক। যুদ্ধচলাকালে জীবনলালের জবানীতে কামানের গোলা সংগ্রহের ব্যাপারে কোম্পানীর সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের বর্ণনা যা দিয়েছেন তা লেখকের নিজের বক্তব্য। কেরী সাহেবের মুন্সীতে রাম'রামের মানসিকতা মূলত লেখকেরই মানসিকতা প্রকাশিত। সতীদাহ প্রথার বিস্ময় পরিণাম হিসেবে মৃত্যুদৃশ্যগুলো মৃত্যু জিজ্ঞাসার সন্ধানে যাত্রা। 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে লেখকের রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে শিল্পসম্মত রূপদানের মধ্যে। ঔপন্যাসিক প্রমথনাথের জীবনের একটি বলিষ্ঠ রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কোথাও হয়েছেন নীতিবাদী।

প্রমথনাথের দৃষ্টিতে মানবমনের দ্বন্দ্ব, নিদারুণ যন্ত্রণা চরিত্র ও ঘটনার আলোকে জীবনদর্শন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আশা ও আদর্শবোধের প্রভাবে জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকের গভীর আগ্রহ লেখকের জীবনদর্শনকে আমাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথের কথা সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছে এখানেই ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রমথনাথের সার্থকতা।

সিদ্ধান্ত

মূল্যায়নের শেষপর্বে পৌছে একথা বলতেই হয়, শিল্পী প্রমথনাথ বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গনে নানা উপাদানে সমৃদ্ধ কথাসাহিতে যে সোনালী ফসল তুলে এনেছেন তা বাংলা সাহিত্যের

মূল্যবান সম্পদ। তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়ে যে কলার জন্য কলা ও জীবনের জন্য কলা সৃষ্টি করে রুচিশীল সাহিত্য আমাদের উপহার দিয়েছেন । তাঁর উপন্যাস পাঠ করে পাঠক নতুন স্বাদ আস্বাদন করে, সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্য বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি বরং সংবেদী পাঠকমনে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় কথাশিল্পী প্রমথনাথ রাজা বাদশা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন রাগিণী যেভাবে পরিবেশন করেছেন তা তাঁর সব্যসাচীত্বই প্রমাণ করে। একদিকে তিনি যেমন মাটির মানুষের জীবনচিত্র কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন তেমনি ঐতিহ্যের বিশ্বাসী হয়ে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের অনিবার্য পরাজয় ও তাদের দেশসেবার মর্মগ্রাহী চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন। আবার জাতীয় গৌরবময় দিকের আলোকপাত করতে গিয়ে স্বদেশচেতনা ও স্বাধীনতার মর্মগাথা শিল্পকর্মে স্থান দিয়ে তৎকালীন জীবন ও সমাজের মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন করেছেন। যুগজীবন ও যুগচেতনা অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মর্যাদা লাভ করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ। সমকালীন আধুনিক জীবনযন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যে বর্ণিতব্য বিষয় না হলেও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সেখানে দুর্লভ হয়ে ওঠে নি।

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও আঙ্গিক সচেতনতায় অভিনবত্ব এনেছেন একথা হয়ত বলার অপেক্ষা রাখে না। কাহিনীর চমৎকারিত্ব, অভাবনীয় কল্পনা শক্তির বিস্তারে, গভীর জীবন বীক্ষণে, বাস্তব চরিত্র অঙ্কনে ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি স্বতন্ত্র ধারার লেখক। আধুনিক মূল্যবোধ স্ফূরণে, জীবনরস পরিবেশনে, ভাষার মন্ডলকলা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি অনন্য। শিল্পীর নিপুণ তুলিতে নিসর্গচিত্র, প্রেমভাবনা, রূপবর্ণনা, কালচেতনা, লোকায়ত জীবনচর্চার বর্ণনায়, নন্দনতত্ত্ব ব্যাখ্যায়, সাহিত্যরস যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়

প্রমথনাথ বিশী একজন মৌলিকপ্রতিভাবান শিল্পী। সমাজ, ইতিহাস ও পুরাণচেতনা, নাট্যগুণ, কাব্যগুণ, সংলাপ নৈপুণ্য ও বর্ণনার মাধুর্যে, অভিনব উপস্থাপন রীতিতে, গভীর চিন্তাশীল মন্তব্যের আলোকে প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যে বিষয়ব্যাপ্তি, শিল্পপ্রকরণ ও অভিনব উপকরণের সমবায়ে যে নতুন সম্পদ রেখে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখনীর স্পর্শে একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ আবিষ্কৃত হল কথাশিল্পী হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর সাফল্য ও সার্থকতা এখানেই। কথাশিল্পভুবনে প্রমথনাথ একক ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ও প্রকাশরীতির পালাবদল ঘটেছে সন্দেহ নেই তবুও তাঁর চিন্তন, মনন ও স্টাইল পাঠকমনে ও উত্তরসূরীদের কাছে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর সাফল্য ও সার্থকতার প্রথম ও শেষ কথা।

সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথনাথ নিবেদিত উপন্যাসগুলির সমীকরণ করলে একটা কথাই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয় যে ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি সার্থক। প্রমথনাথ বিশীর সৃজনশীল সাহিত্য বাংলা কথাশিল্প ভুবনে অমর সম্পদ হয়ে চিরকাল থাকবে তাঁর স্থান সুচিহ্নিত ও তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

উল্লেখপঞ্জী

১) মোহিতলাল মজুমদার - সাহিত্য বিতান পৃঃ ৩১৮

২) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাস পৃঃ ৬৪২ - ৬৪৩

৩) প্রমথনাথ বিশী - 'বঙ্গভঙ্গ' - ব্যাখ্যা অংশ

৪) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় - কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের ষাট বছরঃ ১৯২৩ - ১৯৮২ পৃঃ ২৬৩-২৬৪

৫) 'পঞ্চাশোর্ধ্বম'। রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪) পৃঃ ৪১৭

৬) প্রমথনাথ বিশী - 'পদ্মা' পৃঃ ১৪৮

৭) প্রমথনাথ বিশী - 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পৃঃ ৩০৯

৮) প্রমথনাথ বিশী - 'চলনবিল' পৃঃ ১৩০

৯) 'সাহিত্যের তাৎপর্য রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩) পৃঃ ৭৩৯

১০) রবীন্দ্র বিচিত্রা (১৩৬৪), পৃঃ ৫৬

১১) প্রমথনাথ বিশী - 'পদ্মা' পৃঃ ১২৩

১২) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা' পৃঃ ৪৮৬ - ৪৮৭

১৩) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৬৪৩

১৪) প্রমথনাথ বিশী - 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পৃঃ ১৯৯

১৫) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' - গ্রন্থ পরিচিতি পৃঃ ২২

১৬) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী', পৃঃ ৫০৭

১৭)প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী', পৃঃ ১৪৫

১৮)প্রমথনাথ বিশী - তদেব পৃঃ১৪৬

১৯) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা পৃঃ - ৬৪৩

২০) প্রমথনাথ বিশী - 'দেশের শত্রু' ষষ্ঠ অধ্যায় পৃঃ ৬১

২১) প্রমথনাথ বিশী - 'কোপবতী' পৃঃ ১১৮ - ১১৯

২২) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ১২০ - ১২১

২৩) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ২১০

২৪) প্রমথনাথ বিশী - 'পদ্মা' পৃঃ ৪৮ - ৪৯

২৫) প্রমথনাথ বিশী - তদেব পৃঃ ১৪৯

২৬) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ১৯০

২৭) প্রমথনাথ বিশী - 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পৃঃ ৮

২৮) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ১৭৯

২৯) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ১৭০

৩০) প্রমথনাথ বিশী - 'চলনবিল' পৃঃ ৮৩

৩১) প্রমথনাথ বিশী - তদেব পৃঃ ২০৫

৩২) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ২৫২

৩৩) প্রমথনাথ বিশী - 'অশ্বত্থের অভিশাপ' পৃঃ ৭৪৬

৩৪) প্রমথনাথ বিশী - ' কেরী সাহেবের মুন্সী' পৃঃ ২৯৫

৩৫) ' প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ৪১৩

৩৬) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা' পৃঃ ৩৬৯

৩৭) প্রমথনাথ বিশী - 'বঙ্গভঙ্গ' পৃঃ ৯৩

৩৮) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ১৭৮

৩৯) প্রমথনাথ বিশী - 'পনেরোই আগষ্ট' পৃঃ ৪২৯

৪০) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত - প্রবন্ধ সঙ্কলন পৃঃ ১৬০

৪১) প্রমথনাথ বিশী - 'দেশের শত্রু' পৃঃ ৪৫

৪২) প্রমথনাথ বিশী - 'কোপবতী' পৃঃ১২২

৪৩) প্রমথনাথ বিশী - 'চলনবিল' পৃঃ১৩৪

৪৪) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ৯৬

৪৫) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী' পৃঃ ৫১৬

৪৬) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা' পৃঃ ৪৭৮

৪৭) প্রমথনাথ বিশী - 'বঙ্গভঙ্গ' পৃঃ ১৭০

৪৮) প্রমথনাথ বিশী - 'পনেরোই আগষ্ট' পৃঃ ৪৭৯

৪৯) প্রমথনাথ বিশী - 'কোপবতী' পৃঃ ৫০

৫০)প্রমথনাথবিশী- 'পদ্মা' পৃঃ ১৩৯

৫১) প্রমথনাথ বিশী -'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' -পৃঃ ৩৬

৫২) প্রমথনাথ বিশী - তদেবপৃঃ ৩৮

৫৩) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী' পৃঃ ৪৯৬

৫৪) প্রমথনাথ বিশী - 'পদ্মা' পৃঃ ১৪৪

৫৫) প্রমথনাথ বিশী - 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পৃঃ ৩১৭

৫৬) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা' পৃঃ ৪৭৯

৫৭) প্রমথনাথ বিশী - 'কোপবতী'পৃঃ ১৪৫

৫৮) প্রমথনাথ বিশী - 'পনেরোই আগষ্ট' পৃঃ৪২০

৫৯) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী' পৃঃ ৫১৮

৬০) প্রমথনাথ বিশী - 'পদ্মা' পৃঃ ১৮৫

৬১) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী' পৃঃ ১৪৬

৬২) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা' পৃঃ ৪৫৮

৬৩) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবর মুন্সী' পৃঃ ২৬২

৬৪) কমল কুমার স্যান্যালঃ উপন্যাস বীক্ষা বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকপৃঃ ১৩

৬৫) সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ঃ উপন্যাস তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্রপৃঃ১৮

৬৬) বিনয় ঘোষ ঃ শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ,পৃঃ১১৮